জনস্বাস্থ্য বুলেটিন-৬ (নব পর্যায়)

মনের অসুখ
এবং
প্রতিকার

সংকলন ও সম্পাদনা

গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায় ও অরণি সেন

জন আন্দোলনের মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য

একটি ‘স্বাস্থ্য শিক্ষা উন্নয়ন’ উদ্যোগ

জনস্বাস্থ্য বুলেটিন – ৬ (নব পর্যায়)

মনের অসুখ এবং প্রতিকার

সংকলন ও সম্পাদনা

গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায় ও অরণি সেন

জন আন্দোলনের মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য

একটি 'স্বাস্থ্য শিক্ষা উন্নয়ন' উদ্যোগ

Janaswasthya Bulletin 6 (Naba Parjay)
On Mental diseases and their treatment compiled and edited by Gautam Bandapadhyay & Arani Sen

প্রথম প্রকাশ : ১৫ আগস্ট ২০২৬

গ্রন্থসত্ত্ব : সীমা রায়

প্রকাশনা : অরণি সেন
'স্বাস্থ্য শিক্ষা উন্নয়ন'
৮এ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০০৭৩

পরিবেশনা : 'উবুদশ', ৮এ নবীন পাল লেন। কলকাতা-৭০০০০৯
ফোন: ৯৪৩৩৮১৯১০৩, ৯৪৩৩০৩৬৫৩৩

প্রাপ্তিস্থান : 'প্রতিক্ষণ বই-চা-ঘর'
৫, সূর্য সেন স্ট্রিট (দোতলা, স্টেট ব্যাঙ্কের উপরে)
কলেজ স্কোয়ার, কলকাতা-৭০০০১২

প্রচ্ছদ ও বর্ণস্থাপন : রাজু রায়

মুদ্রণ : শরৎ ইম্প্রেশনস প্রাইভেট লিমিটেড
১৮বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭৩

যোগাযোগ : ssunnayan@gmail.com
www.ssu2011.com

সংগ্রহ : ৮০ টাকা

উৎসর্গ

মনের অসুখে যাঁরা ভুগছেন, তাঁদের পরিবার, পরিজনদের

সূ চি প ত্র

- নিবেদন—মনের স্বাস্থ্য, মনের অসুখ ৭
- ডিপ্রেশন—মানসিক বিষণ্নতা/অবসাদ—ডা. নিতু মল্লিক ৯
- মনোরোগের নাগরদোলা (Bipolar Affective Disorder)
  —ডা. সুপার্থ বড়ুয়া ১৫
- সিজোফ্রেনিয়ার কথা—ডা. গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায় ২০
- উৎকণ্ঠার বিচিত্র রূপ—ডা. সৈকত বৈদ্য ২৮
- অবসেসিভ-কম্পালসিভ ডিসঅর্ডার: মন ও আচরণের দ্বন্দ্ব
  —ডা. শুভেন্দু দত্ত ৩৪
- শিশু এবং কিশোর-কিশোরীদের মানসিক স্বাস্থ্য ব্যাধি
  —ডা. সায়ন মাঝি ৪১
- নেশা—ডা. গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৪
- ডিমেনশিয়া: শুধু স্মৃতি হারানোর গল্প নয়—ডা. ইন্দ্রনীল সাহা ৫৮

নিবেদন

মনের স্বাস্থ্য, মনের অসুখ

এই দুনিয়ায় সফল এবং সুস্থ ভাবে বেঁচে থাকার চাহিদা ও অধিকার সকলেরই আছে। কেবলমাত্র শরীর নয়, সুস্থ থাকার এই নির্দেশক মাপকাঠিতে মন-ও গুরুত্বপূর্ণ।

মন কোনো বায়বীয় পদার্থ নয়, বাস্তবে মনের উৎপত্তি এবং চলাফেরা মস্তিষ্কে। তবে সুস্থ মন বলতে ঠিক কী বোঝায়, তা নিয়ে নানা মুনির নানা মত।

অনেকেই মনে করেন, নিজের ভাবনা চিন্তা আর আবেগের উপর নিয়ন্ত্রণ রেখে পরিস্থিতি বুঝে যাবতীয় কথা বার্তা আর কাজকর্মে ব্যস্ত থাকাটাই মানসিক স্বাস্থ্য।

আরও একটু সরল করে কেউ বলেন, to love, to work and to play এটাই হলো মনের দিক থেকে সুস্থ থাকার সঠিক মাপকাঠি।

তাহলে মনের অসুখ বলব কাকে?

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, আমাদের চিন্তন, আবেগ আর কাজকর্মের ধারা যদি সাধারণ অবস্থা থেকে এতটাই সরে যায় যে আমাদের সামাজিক, পারিবারিক, পারস্পরিক, এমনকি কর্মক্ষেত্রেও যথেষ্ট অসুবিধে সৃষ্টি করে, তবে তাকে "ডিসঅর্ডার" এর মধ্যে রাখা যায়। এই পরিবর্তনটা ঘরের লোকে, কাছের মানুষের চোখেও ধরা পড়ার মতো। অবশ্য যে কেউ বললেই মনের রোগ হয়েছে, এমনটা দাগিয়ে দেওয়া যাবেনা। সেজন্য বিশেষজ্ঞতা দরকার, সুনির্দিষ্ট নিয়ম মেনেই এটি নির্ধারিত হয়। সারা দুনিয়ায় এজন্য গ্রহণযোগ্য শ্রেণীবিন্যাস পদ্ধতিও আছে। মনের অসুখের এই শ্রেণীবিন্যাস আজও মূলতঃ ক্লিনিকাল, অর্থাৎ কি কি হচ্ছে, কতদিন হচ্ছে, কোন্ কোন্ লক্ষণ স্বাভাবিকের সীমানা ছাড়িয়ে যাচ্ছে, ইত্যাদি বহু কিছু মিলিয়ে তবেই নির্ণয় বা ডায়াগনসিস।

সাম্প্রতিকতম পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে প্রাপ্তবয়স্কদের প্রতি সাতজনের একজন অন্তত মনের রোগে ভুগছেন। মানসিক অবসাদ বা ডিপ্রেশন, উদ্বেগ উৎকণ্ঠায় প্রায় পঙ্গু হয়ে যাওয়া অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডার, এসব তো আছেই,

সেই সঙ্গেই আছে বেশ কয়েকটি 'মেজর মেন্টাল ডিসঅর্ডার', যাদের সিভিয়ার মেন্টাল ডিসঅর্ডারও বলা হয়। সিজোফ্রেনিয়া, বাইপোলার মুড ডিসঅর্ডার, এই গোত্রের অসুখ। বিপরীতে ডিপ্রেশন বা অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডার কে কমন মেন্টাল ডিসঅর্ডার-এর মধ্যে রাখা হয়।

সংক্ষিপ্ত পরিসরে এ জাতীয় রোগগুলির বিবরণ এবং নিরাময়ের উপায় বিষয়ক আলোচনাই এই বইয়ের মুখ্য উদ্দেশ্য।

মানসিক রোগ বিষয়ে এই প্রয়াস আপনাদের কাজে লাগলেই এ প্রচেষ্টা সফল হবে।

সম্পাদকমণ্ডলী

'There is no health without
mental health'

—WHO

ডিপ্রেশন—মানসিক বিষণ্নতা/অবসাদ

ডা. নিতু মল্লিক

চিত্রঃ এক

৩০ বছর বয়সী যুবক। শিক্ষিত, কর্মরত। কিন্তু কয়েকমাস থেকে ভুগছে অকারণ ভাল না লাগায়। কিছু ভাল লাগে না, অফিসে অনুপস্থিতি বেড়ে চলে, ভাললাগা গানের সুর অসহ্য লাগে। মন খিটখিটে, খিদে চলে গেছে, আর আছে নির্ঘুম রাতের দিনযাপন। নিজেকে মনে হয় ক্লান্ত, উদ্দেশ্যহীন, আশাহীন, মনের কোণে উঁকি মারে নিজেকে শেষ করে দেবার ইচ্ছা। পরিবার ছুটে আসে চিকিৎসকের কাছে। বলা হয় মানসিক অবসাদ। দীর্ঘ চিকিৎসার পর সে এখন সুস্থ।

চিত্রঃ দুই

অল্পবয়সী মা। ঘরের কাজ, ছোট সন্তান, অফিস সব নিয়ে হিমশিম খান সারাদিন। সর্বত্র সুনাম তার চটপটে আর বুদ্ধিদীপ্ত কাজের জন্য। কয়েকমাস ধরে সঙ্গী তার অসহ্য চাপ ধরা মাথাব্যথা আর অকারণ খিটখিটে মেজাজ। ডাক্তার বলেন ডিপ্রেশন। বিশ্বাস হয় না কিছুতেই। ‘‘না ডাক্তারবাবু। আমার মন তো খারাপ নয়। ওই মাথাব্যথাই সমস্যা। এত কাজের চাপ, মাথা গরম তো মাঝে মাঝে হতেই পারে, তাই না?’’

চিত্রঃ তিন

কলকাতার নামী কলেজের ছাত্র। প্রতি রাতে আবশ্যিক সুরাপান। এক রাতে আত্মহননের চেষ্টা। নেশামুক্তির উদ্দেশ্যে পরিজন নিয়ে আসেন। ছেলেটির পরিবারেও রয়েছে আত্মহননের ইতিহাস। কুণ্ঠিত ছাত্রটি মুখ খোলে অতি সংকোচে ‘‘ঘুম আসে না। ঘুমের জন্য নেশা করি। কিছু ভালো লাগে না আজ অনেক বছর। বাড়ির লোক ভাবে ইচ্ছা করে মিথ্যে বলি। আমাকে ঝাড়ফুঁক পর্যন্ত করা হয়েছে।’’

উপরিউক্ত তিনটি রোগীই প্রকৃতপক্ষে ডিপ্রেশনের শিকার। তাদের রোগের প্রকাশ ভিন্ন ভিন্ন। এগুলি ছাড়াও আরও অনেক ভাবে মানসিক

অবসাদ প্রকাশ পেতে পারে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সঠিক সময়ে রোগ নির্ণয় হলে অবসাদ নিরাময়যোগ্য।

Common Mental Disorders বা সাধারণ মানসিক সমস্যার মধ্যে প্রধান গুরুত্বপূর্ণ রোগ হল ডিপ্রেশন। বিশ্বে প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে অবসাদের হার ৫.৭% (WHO) যার মধ্যে পুরুষদের মধ্যে অবসাদের হার ৪.৬%, মহিলাদের মধ্যে ৬.৯% এবং বয়স্কদের মধ্যে (>৭০ বছর) ৫.৭%। ভারতবর্ষে, সামগ্রিক অবসাদের হার ২.৭% (National Mental Health Survery, 2015-16)। শিশুদের মধ্যেও ডিপ্রেশন একটি ক্রমবর্ধমান মানসিক সমস্যা হিসাবে দেখা দিয়েছে।

ডিপ্রেশন কি?

এটি একটি মানসিক অবস্থা, যা কেবল সাময়িক মনখারাপ বা দুঃখের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। রোগনির্ণয়ের জন্য লক্ষণগুলি কমপক্ষে দুসপ্তাহ থাকতে হবে এবং এগুলি হল—

* প্রায় সবসময় মন খারাপ বা শূন্যতা অনুভব করা
* আগের পছন্দের কাজগুলোতে আগ্রহ হারিয়ে ফেলা
* অতিরিক্ত ক্লান্তি বা শক্তির অভাব
* ঘুমের সমস্যা (অতিরিক্ত ঘুম বা একেবারেই ঘুম না হওয়া)
* নিজেকে মূল্যহীন বা অপরাধী মনে হওয়া
* ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অতিরিক্ত হতাশা
* মৃত্যুচিন্তা

এই লক্ষণগুলি স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত করে। এটি কেবল মানসিক দুর্বলতা নয়, বরং বিভিন্ন বায়োলজিক্যাল কারণ, সামাজিক কারণ, ব্যক্তিত্ব এসবের সম্মিলিত ফল।

বিভিন্ন উদ্বেগমূলক পরিস্থিতিতে মানসিক অবসাদ হলেও অনেক সময় ডিপ্রেশনের পিছনে সেরকম কোন মানসিক চাপের ইতিহাস পাওয়া যায় না। কারণ অনেক ডিপ্রেশনই বায়োলজিক্যাল এবং ডিপ্রেশনের পিছনে সহজবোধ্য কারণ থাকা বাধ্যতামূলক নয়।

ডিপ্রেশন সম্পর্কে প্রচলিত মিথ

১) ‘‘সাময়িক মনখারাপ (যেকোনো খারাপ অভিজ্ঞতার কারণবশত)

মানেই ডিপ্রেশন''—আসলে অবসাদ একটি দীর্ঘস্থায়ী মনখারাপের সমস্যা যাতে সাধারণতঃ চিকিৎসার প্রয়োজন হয়।

২) ''মন শক্ত করলেই ডিপ্রেশন কেটে যায় বা যে ডিপ্রেশনে ভুগছে সে মানসিক ভাবে দুর্বল''—অবসাদ একটি স্নায়ুঘটিত রোগ যার সাথে রোগীর মানসিক শক্তির সম্পর্ক খুবই অল্প।

৩) ''মন খুলে অনেকের সঙ্গে কথা বললেই ডিপ্রেশন কেটে যায়''—অত্যন্ত সফল, বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যক্তিও ডিপ্রেশনের শিকার হতে পারেন শুধুমাত্র বায়োলজিক্যাল কারণে।

৪) ''ডিপ্রেশন মানে পাগলামি''—তথাকথিত পাগলামির সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই।

এইসব সামাজিক নিন্দা বা স্টিগমার কারণে রোগী সাহায্য চাইতে দেরি করে ও রোগ হাতের বাইরে চলে যায়।

ডিপ্রেশনের কারণ কী?

১) বায়োলজিক্যাল: মস্তিষ্কের নিউরোট্রান্সমিটার যেমন সেরোটনিন ও ডোপামিনের ভারসাম্যহীনতা ডিপ্রেশনের সঙ্গে জড়িত।

২) বংশগতি: পরিবারে ডিপ্রেশন/সুইসাইড/মানসিক রোগের ইতিহাস ঝুঁকি বাড়ায়।

৩) দীর্ঘস্থায়ী মানসিক চাপ ও ট্রমা: শৈশবে শারীরিক ও যৌন অত্যাচার, প্রিয়জনের মৃত্যু, আর্থিক সংকট ইত্যাদি।

৪) দীর্ঘস্থায়ী শারীরিক অসুস্থতা ও শারীরিক কষ্টপূর্ণ রোগ: যেমন ক্যানসার, নিউরোলজিক্যাল ও অটোইমিউন রোগ। ডায়াবেটিস ও হৃদরোগ অনেক বয়স্ক মানুষের অবসাদের জন্য দায়ী।

৫) সামাজিক ও পরিবেশগত কারণ: একাকীত্ব ও পারিবারিক দ্বন্দ্ব।

ডিপ্রেশন কিভাবে নির্ণয় (ডায়াগনোসিস) করা হয়?

একজন মনোরোগ বিশেষজ্ঞ (সাইকিয়াট্রিস্ট) এবং মনোবিদ (সাইকোলজিস্ট) এই রোগ নির্ণয় করেন—

১) রোগীর লক্ষণগুলির ইতিহাস শুনে

২) রোগীর অন্যান্য অসুস্থতার ইতিহাস থেকে

৩) কখনো সাইকোলজিক্যাল টেস্ট ব্যবহার করে (screening tools, questionnaires)

৪) কিছু শারীরিক পরীক্ষার মাধ্যমে একই রকম লক্ষণ সৃষ্টিকারী অন্যান্য শারীরিক অসুখ চিহ্নিত করে।

কোন রক্তপরীক্ষা বা স্ক্যান ডিপ্রেশনের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে পারে না। ডায়াগনোসিস বেশিটাই উপসর্গভিত্তিক।

ডিপ্রেশন কেন গুরুত্ব দিয়ে দেখা দরকার?

অবসাদ অচিকিৎসিত অবস্থায় থেকে গেলে, এটি মানুষের ব্যক্তিগত জীবন, পারিবারিক সম্পর্ক, কাজের দক্ষতা ও শারীরিক স্বাস্থ্যের ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলতে পারে। গুরুতর ক্ষেত্রে এটি আত্মহানির ঝুঁকি বাড়ায়। তাই সময়মত সঠিক চিকিৎসা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ডিপ্রেশনের চিকিৎসা

ডিপ্রেশন চিকিৎসাযোগ্য ও নিরাময়যোগ্য। সঠিক চিকিৎসার মাধ্যমে অধিকাংশ মানুষ সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারেন।

১) মনোরোগ বিশেষজ্ঞ (Psychiatrist)-এর সহায়তা

অনেক ক্ষেত্রেই ওষুধ অপরিহার্য, তাই প্রথমে ডাক্তারবাবুকে দেখানো প্রয়োজন। ওষুধের সঙ্গে দরকার হয় থেরাপির।

২) মনোবিদ বা সাইকোলজিস্ট—

এনারা বিভিন্ন থেরাপির (CBT, IPT etc.) মাধ্যমে ডিপ্রেশনের চিকিৎসা করে থাকেন। কম মাত্রায় ডিপ্রেশনে ওষুধ ছাড়াই থেরাপি ব্যবহার করা যায়।

৩) পারিবারিক ও সামাজিক সমর্থন—

কাছের মানুষের সহানুভূতিশীল আচরণ রোগীর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দোষারোপ নয়, বরং বোঝার চেষ্টা করা জরুরি।

৪) জীবনযাত্রার পরিবর্তন

- নিয়মিত ঘুম
- পুষ্টিকর খাবার
- ব্যায়াম/হাঁটা
- নেশাদ্রব্য এড়িয়ে চলা (বিশেষত: Alcohol)

৫) নিজের যত্ন নেওয়া (Self care)

- নিজের অনুভূতি প্রকাশ করা
- চাপ কমানোর কৌশল শেখা
- ছোট ছোট সাফল্যকে গুরুত্ব দেওয়া
- কোন হবি (hobby) পালন করা

ডিপ্রেশন আক্রান্ত মানুষের প্রতি আমাদের দায়িত্ব

ডিপ্রেশনে আক্রান্ত ব্যক্তিকে ''এভাবে ভেবো না'' বা ''মন শক্ত কর'' বা ''আমি নিজেও এরকম পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠেছি মনের জোরে''—এসব কথা তাদের কষ্ট আরও বাড়িয়ে নিতে পারে। বরং—

- মন দিয়ে তাদের কথা শোনা কোন বিচার না করে (Non judgemental)
- তাদের অনুভূতিকে গুরুত্ব দেওয়া
- চিকিৎসকের সাহায্য দিতে উৎসাহিত করা

এই ছোট ছোট পদক্ষেপও কারও জীবনে বড় পরিবর্তন আনতে পারে।

সাহায্য চাওয়া কখন জরুরি?

- নৈরাশ্য থেকে চিন্তা আসে যে এই পরিস্থিতি থেকে বেরোবার উপায় নেই।
- আত্মহত্যার কথা বলে বা পরিকল্পনা করে
- কাজকর্ম একেবারেই বন্ধ করে দেওয়া

জরুরি সাহায্যের জন্য যোগাযোগ করুন

১. নিকটবর্তী হাসপাতালের এমার্জেন্সি

২. হেল্প লাইন (Tele-Manas)

৩. বিশ্বাসযোগ্য কারো কাছে জরুরি সাহায্য প্রার্থনা

আপনি একা নন এবং সাহায্যের হাত প্রস্তুত আছে।

কিছু প্রশ্নোত্তর

প্রঃ সেরে যাওয়ার পরেও কি অবসাদ ফিরে আসতে পারে?

উঃ হ্যাঁ। কিছু মানুষ রেকারেন্ট ডিপ্রেশনে ভোগেন, তাদের দীর্ঘস্থায়ী (Long term) চিকিৎসার প্রয়োজন।

প্রঃ আমি কি অ্যান্টিডিপ্রেসান্ট ওষুধে আসক্ত হয়ে পড়ব?

উঃ অ্যান্টিডিপ্রেসান্ট ওষুধ আসক্তি তৈরি করে না, চিকিৎসায় সাড়া দিলে এটি বন্ধ করা সম্ভব।

প্রঃ অ্যান্টিডিপ্রেসান্ট ওষুধে কি আমার ব্যক্তিত্ব বদলে যাবে?

উঃ অ্যান্টিডিপ্রেসান্ট ওষুধ অবসাদ সারায় মাত্র, ব্যক্তিত্ব পরিবর্তন করে না।

প্রঃ ডিপ্রেশনে কি সারাজীবন স্থায়ী হতে পারে?

উঃ সবসময় নয়। তবে প্রত্যেক রোগীর অভিজ্ঞতা ভিন্ন। খুব কম শতাংশ রোগীর ক্ষেত্রে ডিপ্রেশনে বহুদিন চলতে পারে।

সাপোর্ট সার্ভিস

১. Tele manas (14416)

২. বিভিন্ন NGO helplines

ডা. নিতু মল্লিক, অ্যাসিস্টেন্ট প্রফেসর, মনোরোগ বিভাগ, কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ

মনোরোগের নাগরদোলা (Bipolar Affective Disorder)

ডা. সুপার্থ বড়ুয়া

মানসিক স্বাস্থ্য তথা মানসিক রোগের চিকিৎসা নিয়ে আমাদের ছুতমার্গ অনেক পুরানো। শারীরিক স্বাস্থ্যের সঙ্গে সঙ্গে মানসিক স্বাস্থ্যের যত্ন রাখা যে একইভাবে প্রয়োজনীয় এই কথাটা আমরা অনেক সময় স্বীকার করতেই চাইনা। আর কোন মানসিক রোগের সূত্রপাত হলে সেটিকে অবহেলা করা, বিনা চিকিৎসায় রোগের এবং রোগীর জটিলতা বৃদ্ধি করা অথবা অনেক চেষ্টাচরিত্রের পর চিকিৎসা শুরু হলেও চিকিৎসকের পরামর্শ অবহেলা করা এতো নিত্যদিনের ঘটনা। এইসব কিছুর পিছনে লুকিয়ে আছে মানসিক রোগ, তার লক্ষণ, তার চরিত্র এবং তার চিকিৎসা নিয়ে আমাদের দীর্ঘদিনের অজ্ঞতা। বিভিন্ন মানসিক রোগের লক্ষণগুলো আমাদের কাছে সুপরিস্ফুট নয়। সুতরাং রোগের লক্ষণ চিহ্নিত করে দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা অনেক সময় বিলম্বিত হয়। ফলস্বরূপ রোগী এবং তার আত্মীয় পরিজনের জীবন অনেকসময় দুর্বিসহ হয়ে ওঠে। অনেক সময়ই এই রোগের পরিসমাপ্তি ঘটে আত্মহত্যার মতো মর্মান্তিক ঘটনার মধ্য দিয়ে।

আজ আমরা আলোচনা করবো এমন একটি মানসিক রোগ, তার লক্ষণ এবং তার চিকিৎসা নিয়ে যার প্রকোপ গোটা বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত। বর্তমান পৃথিবীর ১-৩ শতাংশ লোক এই রোগে আক্রান্ত। এই রোগটির নাম হলো বাইপোলার আফেক্টিভ ডিজ্‌অর্ডার (Bipolar Affective Disorder)। প্রচুর মানুষ আছেন যাদের মধ্যে শুধুই মানসিক অবসাদের লক্ষণ বিদ্যমান। মানসিক রোগের পরিভাষায় এইসমস্ত ব্যক্তিরা মানসিক অবসাদগ্রস্থ অথবা তাঁরা Unipolar Depressionএ ভুগছেন। এবার চিন্তা করে দেখুন কোন ব্যক্তির মধ্যে যদি মানসিক অবসাদ এবং উত্তেজনা এই দুটি রোগের লক্ষণ একইসঙ্গে অথবা বিভিন্ন সময়ে ফুটে ওঠে, তাহলে কেমন হয়। হ্যাঁ, এটাই সম্ভব। কারণ এইসমস্ত ব্যক্তিরাই Bipolar Affective Disorder এ আক্রান্ত, যা আমাদের বর্তমান লেখনীর আলোচ্য।

মানসিক অবসাদের উল্লেখ পাওয়া যায় হোমারের ইলিয়াডে, যেখানে সেনাপতি আজেক্স আত্মহত্যা করেছিলেন বোধ করি মানসিক অবসাদগ্রস্থ হয়ে। মনে করে দেখুন রামায়ণে লক্ষ্মণের মৃত্যুবরণের ঘটনাটি। সরযূ নদীতে ঝাঁপ দিয়ে নিজের জীবনের পরিসম্পাতি ঘটালেন অমিত পরাক্রমশালী লক্ষ্মণ। তার পিছনেও কি ছিল এই মানসিক অবসাদ? মানসিক অবসাদের উল্লেখ পাওয়া যায় খৃষ্টপূর্ব ৪০০ বছর আগে হিপোক্রিটের লেখনীতে। ১৮৫৪ সালে জুলস ফালরেট উল্লেখ করলেন এমন এক মানসিক রোগের কথা যার সঙ্গে বর্তমান Bipolar Affective Disorder এর অনেক সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। সময়ের সারণী বেয়ে একটু এগিয়ে চলুন। এলো ১৮৮২ সাল। জার্মান মনোরোগ বিশেষজ্ঞ কার্ল বালবাস চিহ্নিত করলেন Cyclothymia নামের একটি মানসিক রোগ, যার সঙ্গে আমাদের আলোচিত রোগের সাদৃশ্য প্রচুর। এলো ১৮৯৯ সাল, বিশিষ্ট মনোরোগ বিশেষজ্ঞ এমিল ক্রেপলিন চিহ্নিত করলেন Manic Depressive Psychosis বলে একটি রোগ, এই রোগটিই বর্তমানে আমাদের কাছে Bipolar Affective Disorder নামে পরিচিত।

এবার আপনাদের একটু পরিচয় করাই এই রোগের লক্ষণগুলি নিয়ে যাতে চিহ্নিতকরণ সহজ হয়। মানসিক অবসাদের লক্ষণগুলি কম বেশি আমরা অনেকেই জানি। অন্তত দুই সপ্তাহের জন্য যদি নিম্নলিখিত লক্ষণগুলির ভিতরে কিছু দেখা যায় তাহলে বুঝতে হবে আপনি মানসিক অবসাদগ্রস্থ—

১) মনখারাপ, সাধারণত গোটা দিন ধরেই

২) আনন্দের অভাব বা দৈনন্দিন কাজের ইচ্ছা না জাগা

৩) ওজন হ্রাস (কিন্তু আপনি কোন নির্দিষ্ট খাদ্যাভাস অনুসরণ করছেন না)

৪) অতিরিক্ত মানসিক এবং শারীরিক ক্লান্তি, খিদে এবং ঘুম কমে যাওয়া

৫) অতিরিক্ত আত্মগ্লানি

৬) কাজে মনোযোগের অভাব

৭) আত্মহননের চিন্তা মনে আসা অথবা প্রচেষ্টা করা

এবার আসুন দাঁড়িপাল্লার অপর দিকটার সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করাই। এইদিকটা হলো Manic বা Hypomanic স্থিতি। এইক্ষেত্রে অবশ্য আপনাকে দুই সপ্তাহ অপেক্ষা করার প্রয়োজন নেই, মাত্র এক সপ্তাহই যথেষ্ট। যখন আপনি লক্ষ্য করবেন—

১) অতিরিক্ত উত্তেজনা অথবা বিরক্তির ভাব

২) অতিরিক্ত মানসিক এবং শারীরিক সক্ষমতা

৩) অতিরিক্ত কথা বলা

৪) মনের ভিতরে অনেক চিন্তার একই সঙ্গে উদয়

৫) নিজেকে একজন কেউকেটা মনে করা

৬) অতিরিক্ত টাকাপয়সা খরচ করা, টাকা নষ্ট করা অথবা এমন কাজে টাকা ব্যয় করা যাতে লাভের থেকে ক্ষতির সম্ভাবনা অনেক বেশি।

উপরের সমস্ত লক্ষণের সংমিশ্রণ যদি কোনো ব্যক্তির মধ্যে দেখা যায় তাহলে বুঝতে হবে সেই ব্যক্তি Bipolar Affective Disorder এ আক্রান্ত।

এই Bipolar Affective Disorder কে আবার অনেক Subdomain এ বিভক্ত করা যায়, যেমন Bipolar I, Bipolar II, Dysthymia, Cyclothymia, Bipolar Spectrum Disorder ইত্যাদি ইত্যাদি। সমস্ত রোগের বিবরণ একসঙ্গে একজায়গায় দিয়ে পাঠককুলের মস্তিষ্ক ভারাক্রান্ত করা থেকে বিরত থাকা উচিত বলেই আমার বিশ্বাস। শুধু এই রোগের ব্যাপ্তি সম্পর্কে একটু অবগত করার জন্য জানিয়ে রাখি গোটা বিশ্বে ০.৩-৪.৮% লোক তাঁদের জীবনের কোন না কোন সময় এই রোগে আক্রান্ত হয়েছেন। পরিসংখ্যানই বলে দিচ্ছে এই রোগের তীব্রতা এবং ব্যাপ্তি কতটা বিশাল। যারা এই রোগে আক্রান্ত হন তাদের মধ্যে বিভিন্ন নেশার বস্তু বিশেষত মদ্যপানের প্রবণতা অনেক বেশি।

এবার একটু আলোচনা করে নেওয়া যাক এ রোগটির সূত্রপাত এবং স্থায়িত্ব নিয়ে। পরিসংখ্যানের দিকে লক্ষ্য রাখলে দেখা যাবে অন্তত ৫০ শতাংশ লোক যাঁরা এই রোগে আক্রান্ত তাদের ভিতরে এই রোগের প্রথম লক্ষণ ধরা পড়েছিল ৪০ বছরে বা তার আগে। পরিসংখ্যান আরও বলছে একবার মানসিক অবসাদগ্রস্থ হয়ে পড়লে তার প্রভাব থাকে অন্তত ৬ থেকে ১৩ মাস, অপরদিকে Manic period স্থায়িত্ব থাকে অন্তত ৩ মাস। মানসিক অবসাদগ্রস্থ হয়ে পরার অন্তত ৬ বছর পর প্রথম Mania এর লক্ষণ গুলো দেখা যেতে পারে। তাই বিভিন্ন ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে যাঁরা চিকিৎসকের নির্দেশ অমান্য করে ওষুধ খাওয়া বন্ধ করে দেন তাঁদের ক্ষেত্রে এই রোগের পুনরাগমন ঘটে অতি শীঘ্র। এই রোগের অপর একটি বিশেষত্ব হলো চক্রাকারে পুনরাগমন। যত সময় এগোতে থাকে মানসিক অবসাদগ্রস্ততা এবং Manic period এর মধ্যের ব্যবধান সঙ্কুচিত হতে থাকে। দেখা গেছে পাঁচটি episode এর পর মধ্যের সুস্থতার ব্যবধান কমে দাঁড়ায় মাত্র ৬-৯ মাস। এর থেকেই

একটা ব্যাপার পরিষ্কার যে সময় যতো এগোয় এই রোগ কত ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করতে পারে।

কিন্তু আমরা কিভাবে এই রোগের সঙ্গে লড়াই করতে পারি। Bipolar Affective Disorder এর মতো প্রবল পরাক্রান্ত শত্রুর সঙ্গে লড়াই করার জন্য আমাদের অস্ত্রাগারে অস্ত্রের সমাহার কেমন সেটাও জানা আমাদের অবশ্য কর্তব্য। উত্তর হলো শত্রু যতই পরাক্রমশালী হোক না কেন তাকে প্রতিহত করার জন্য মানসিক রোগ চিকিৎসকদের অস্ত্রভাণ্ডার পরিপূর্ণ। সেগুলোর দিকে একবার দৃষ্টিপাত করা যাক।

(i) Anti-depressants

(ii) Anti psychotics (First generation and Second generation)

(iii) Mood-Stabilizers (Anticonvulsants and Non Anti-Convulsants)

উপরের তিনটি হলো ওষুধের বিভাগ, যা এই রোগকে প্রতিহত করতে এবং এই রোগের লক্ষণগুলির তীব্রতা কমাতে সক্ষম। Medications ছাড়াও আরও কিছু চিকিৎসা পদ্ধতি আছে যার মাধ্যমেও এই রোগের সঙ্গে লড়াই করা সম্ভব। সেগুলি হলো—

(i) Congnitive Behaviour Therapy

(ii) Interpersonal Therapy

(iii) Psychoanalytically Oriented Therapy

(iv) Family Therapy

(v) Phototherapy and Vagal Nerve Stimulation (Photobiomodulation)

(vi) Transcranial Magnetic Stimulation

বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই চিকিৎসকরা এক বা একাধিক পদ্ধতির সংমিশ্রণে চিকিৎসা করেন, যাতে অধিকতর ভালো ফল পাওয়া সম্ভব। তবে নিরাশার কথা একটাই একাধিক চিকিৎসা পদ্ধতি থাকা সত্ত্বেও বেশিরভাগ লোক তাদের জীবনকালে একাধিকবার এই রোগে আক্রান্ত হন। আগামী ভবিষ্যতে আমরা নিশ্চয়ই এমন চিকিৎসা পদ্ধতির সন্ধান পাবো যার মাধ্যমে আমরা এই রোগ এবং তার লক্ষণগুলিকে আরও ভালোভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবো।

পরিশেষে পাঠকদের উদ্দেশ্যে এই বার্তাই পৌঁছে দেওয়ার আছে যে মানসিক রোগ এবং রোগগ্রস্থ ব্যক্তিরা অদ্ভুত নন। এই রোগ হওয়ার যেমন

কারণ আছে তেমনই এই রোগের উপযুক্ত চিকিৎসা আছে। ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে আমরা যদি রোগ এবং রোগী দুজনকেই পর্দার আড়ালে রাখি তাহলে এ রোগের তীব্রতা বাড়তে বাধ্য। তাতে যেমন একদিকে যে ব্যক্তি এই রোগাক্রান্ত তার জীবন ধীরে ধীরে ধ্বংসের পথে এগিয়ে যাবে তাকে ঘিরে অন্য যারা আছে তাদের জীবনও দুর্বিসহ হয়ে উঠবে। তাই এই লেখনীর মাধ্যমে সমাজের সর্বস্তরের কাছে আমাদের একটাই আবেদন থাকবে আপনারা এগিয়ে আসুন, রোগের সাধারণ লক্ষণগুলি চিহ্নিত করুন এবং উপযুক্ত চিকিৎসাপদ্ধতির সাহায্য নিয়ে মানসিক রোগ মুক্ত একটি সমাজ গড়ে তোলার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ হন।

ডা. সুপার্থ বড়ুয়া, অ্যাসিস্টেন্ট প্রফেসর, মনোরোগ বিভাগ, কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ

সিজোফ্রেনিয়ার কথা

ডা. গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়

মনের অসুখের কথা উঠলে সবার আগে 'সিজোফ্রেনিয়া'র কথাই মনে আসে আমাদের। একমুখ দাড়ি গোঁফ, জট পড়া চুলে বিশ্ব সংসার হারিয়ে ফেলা, আকাশের গায়ে আঙুল তুলে শাসিয়ে যাওয়া, কিম্বা পথের ধারে একা একা বিড়বিড় করা মানুষটাই তো মনোরোগের আসল প্রতীক।

রোগটা ঘিরে তাই হাজার বদনাম আর লাখো ভয়—মিথের পাহাড় আর স্টিগমার দেওয়াল।

মনের অসুখে যাঁরা ভোগেন, বহুদিন থেকেই তাঁদের "সাইকোসিস" আর ''নিউরোসিস'', এই দুটি দলে ভাগ করা হয়। নিউরোসিস-কে এককথায় 'মনস্তাপ' বলা যেতেই পারে, কারণ এঁরা নানারকম সংশয়ে, দুঃখ বোধে, ঘুরেফিরে একই কথা বলেন, ভাবেন, এবং উদ্বেগ আর অসন্তুষ্ট ভাবই এঁদের প্রকৃতি।

সাইকোসিস এর চেয়ে আলাদা। এদের অদ্ভুত ভাবনা আর অলীক ভয়, অসংলগ্ন কথাবার্তা এবং আপাত উদ্দেশ্য বিহীন ধরন ধারণে সাধারণ মানুষের চোখেও স্পষ্ট হয়ে যায় এঁরা স্বাভাবিক না, 'পাগল'।

সিজোফ্রেনিয়া রোগটি এমনই এক সাইকোসিস মাত্র। সারা পৃথিবীর সব দেশেই যা হয়।

অনেকেই মনে করেন সিজোফ্রেনিয়া হওয়া মানেই জীবন শেষ, এমনকি রোগটাকে মনের রোগের 'ক্যান্সার'ও ভাবেন তাঁরা।

সত্যিই কি ভাই? রোগনির্ণয় এবং পরিণতি, এই দুই দিক ঘিরে সংশয়ই হয়ত এ রোগকে এমন ''কলঙ্কিত নায়ক'' বানিয়ে তুলেছে। হাজার মিথের জন্ম দিয়েছে, স্টিগমা বাড়িয়েছে।

কয়েক দশক আগে নোবেলজয়ী এক গণিতজ্ঞের জীবন নিয়ে ''এ বিউটিফুল মাইন্ড'' নামের একটা সিনেমা তৈরি হয়েছিল। এ ছবির প্রটাগনিস্ট ভদ্রলোকের নাম জন ফোর্বস ন্যাশ, বিশ্বখ্যাত ''গেম থিওরি''র প্রবক্তা হলেও দীর্ঘদিন সিজোফ্রেনিয়া রোগে ভুগেছেন তিনি। বিষয়টা জেনে অনেকেই অবাক হয়েছিলেন এরকম একটা লোক সর্বোচ্চ পর্যায়ের এমন তত্ত্ব আবিষ্কার করেন কি করে?

রোগটাকে না বুঝে অচ্ছুত করে রাখার ফলেই এমন ভাবনার জন্ম হয়। এটা যে একটা রোগ, কোনো দৈব-নিগ্রহ নয়, তা বুঝতে অবশ্য বহু সময় লেগেছে মানুষের।

দেড় দু'শো বছর আগেও চিকিৎসক মহলের ধারণা ছিল সবরকমের মনের অসুখই আসলে একটা রোগেরই নানারকম প্রকারভেদ মাত্র। উনবিংশ শতকের শেষ দিকে জার্মান বিজ্ঞানী এমিল ক্রেপেলিন রোগ লক্ষণের বিবরণ, স্থায়িত্ব, গতিপ্রকৃতি এইসবের ভিত্তিতে দেখালেন সব রোগই একরকম নয়। কিছু রোগ আবেগকেন্দ্রিক, সেখানে কখনও অবসাদ, আবার কখনও চূড়ান্ত উৎফুল্ল অবস্থা ঘুরেফিরে আসে, রোগের দশার বাইরে বাকি সময়টা রোগীদের একটা বড় অংশ ভালই থাকে—একে 'ম্যানিক ডিপ্রেসিভ ইনস্যানিটি' বলে।

আরেক ধরণের রোগে রোগ লক্ষণ একবার শুরু হয়ে ধীরে ধীরে খারাপ পরিণতির দিকেই এগিয়ে চলে। এই রোগে আক্রান্ত রোগীদের বাস্তব জগতের সঙ্গে যেন কোনো যোগাযোগই থাকে না।

ক্রেপেলিন সাহেবের এই বর্ণনার কয়েক দশক আগেই বিজ্ঞানী মোরেল এমন রোগ লক্ষণ সমন্বয়কে 'দেমেসে প্রিকসে', অর্থাৎ 'কম বয়সের চিত্তভ্রম' বলেছিলেন। ক্রেপেলিনও প্রায় সেই নামটিই বহাল রেখে একে 'ডিমেনশিয়া প্রিকক্স' বললেন।

এর কয়েক বছর পর (১৯১১) সুইস বিজ্ঞানী ইউজেন ব্লিউলার নামটি বদলে 'সিজোফ্রেনিয়া' রাখলেন। বাংলা ভাষায় যাকে "খন্ডিত মন"ও বলা যায়। তাঁর মতে মস্তিষ্কের চিন্তা ভাবনা, আবেগ এবং কার্যকারিতার মধ্যে সমন্বয়ের অভাবে একটা বিচ্ছিন্নতা তৈরি হওয়ার কারণেই চারপাশের বাস্তব জগত থেকে আলাদা হয়ে যান রোগী।

অন্যান্য মনের অসুখ, যেমন, মানসিক অবসাদ, উৎকণ্ঠা, কিম্বা বাইপোলার মুড ডিসঅর্ডারের সঙ্গে তুলনায় সিজোফ্রেনিয়া রোগে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বেশ কম হলেও আসল সমস্যাটা হলো এ রোগের স্থায়িত্ব আর সমাজ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ায়।

সিজোফ্রেনিয়া আক্রান্ত রোগীদের অনেকেই ঠিক সময়ে চিকিৎসা পায়না যার প্রথম কারণ রোগটা সম্পর্কে নানান সংস্কার আর ভুল ধারণা।

আর দ্বিতীয় দিকটা হলো চিকিৎসা ব্যবস্থার অপ্রতুলতা।

যেহেতু রোগটার শুরু বয়ঃসন্ধির শেষ দিকে অথবা সামান্য পরে, কাজে কাজেই সিজোফ্রেনিয়ার অভিঘাত কেরিয়ার থেকে লেখাপড়া, সম্পর্ক স্থাপন থেকে পরিবার, সর্বত্রই ছাপ রাখে।

এখন প্রশ্ন হলো, রোগটা চিনবেন কিভাবে?

এটা জেনে রাখা ভালো, কেবলমাত্র সিজোফ্রেনিয়া নয়, কাছাকাছি রোগ লক্ষণ নিয়ে আরও বেশ কয়েকটি রোগ আছে, যাদের প্রত্যেকটির বৈশিষ্ট্য হলো বাস্তবের সঙ্গে সাময়িক অথবা দীর্ঘমেয়াদি বিচ্ছিন্নতা loss of reality contact। সেকারণেই অলীক ভাবনা চিন্তা, কোনো বিষয় বা বস্তু সম্পর্কে বিভ্রান্ত অথচ বদ্ধমূল ধারণাও অনায়াসে মেনে নেয় আক্রান্ত রোগীটি। চারপাশের ঘটমান জগতের অনেক কিছুই তাকে উদ্দেশ্য করেই হচ্ছে, কেউ যন্ত্র দিয়ে তাকে নিয়ন্ত্রণ করছে, অলক্ষ্যে থেকে নির্দেশ দিচ্ছে, তার কাজকর্মের ধারাবিবরণী দিয়ে চলেছে, এমন অসংখ্য অসম্ভব বিষয়কেও নির্দ্বিধায় সত্যি বলে মেনে নিতে এই বিশৃঙ্খল মনের কোনো অসুবিধাই হয়না।

রোগ লক্ষণের তারতম্যে এদের কোনওটা ডিল্যুশনাল ডিসঅর্ডার (হ্যালুসিনেশন না, অমূলক ধারণা এবং বিভ্রান্তিই যেখানে প্রধান), কোনওটি আবার সিজোঅ্যাফেক্টিভ ডিসঅর্ডার (যেখানে সাইকোসিস ছাড়াও আবেগ ঘটিত এপিসোড বা দশাও থাকে)।

অতএব রোগ লক্ষণের ভিত্তিতে সিজোফ্রেনিয়া হয়েছে কি না হয়েছে নির্ধারণ করতে হলে শ্রেণীবিন্যাস নির্দিষ্ট বেশ কয়েকটি বৈশিষ্ট্য একটা নির্দিষ্ট সময় ধরে হচ্ছে কিনা সে বিচারও করতে হবে।

এইসব বাছবিচারের শর্ত মানাটা জরুরি, নইলে যে কোনো সাইকোসিসকেই সিজোফ্রেনিয়া বলে দাগিয়ে দেওয়া অসম্ভব নয়।

শ'দেড়েক বছর ধরে এভাবেই সিজোফ্রেনিয়া রোগটি নির্ণয়ে যে রূপরেখাটা উঠে এসেছে তা মোটামুটি এইরকম—

কোনো মানুষের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত পাঁচটি লক্ষণের মধ্যে দুই বা ততোধিক লক্ষণ শেষ একমাস অথবা তারচেয়ে বেশি সময় ধরে উপস্থিত থাকলে সিজোফ্রেনিয়া বলা যায়।

মনোরোগ বিশেষজ্ঞদের মতে (DSM-5 অনুসারে) অন্তত ছয় মাস ধারাবাহিক ভাবে রোগ লক্ষণ গুলির উপস্থিতি ও রোগটা যে সিজোফ্রেনিয়া-ই, অন্য কোনো মনোরোগ নয় সেটা প্রমাণ করে।

লক্ষণগুলো হ'ল—

১) ডিল্যুশন বা বিভ্রান্তি

২) হ্যালুসিনেশন বা অমূলপ্রত্যক্ষ

৩) ডিসঅর্গানাইজড স্পিচ বা সামঞ্জস্যহীন এলোমেলো কথাবার্তা

৪) একেবারেই বিশৃঙ্খল বা গ্রসলি ডিসঅর্গানাইজড অথবা ক্যাটাটনিক বিহেভিয়ার

এবং

৫) নেগেটিভ সিম্পটমস্

রোগ লক্ষণের ভিত্তিতে আরও একটু অন্যরকম ভাবেও বলা যায় বৈকি।

ডিল্যুশন, হ্যালুসিনেশন এবং বিশৃঙ্খল আচরণ, কথাবার্তাকে এককথায় পজিটিভ সিম্পটমস্ বলে।

পজিটিভ লক্ষণ বলতে যা অবান্তর, অপ্রয়োজনীয়, যেমন, কেউ কথা না বললেও স্পষ্ট শুনছি, ঘরের চালে বসে কথা বলছে কারা। এটা একা একা কথা বলা, বিড়বিড় করা থেকেও এটা অনুমান করা যায়। কেউ নেই, অথচ স্পষ্ট দেখছি, এসব বোঝায়।

নেগেটিভ লক্ষণ মানে বাহ্যিক আচরণে, কথাবার্তায়, যা থাকার কথা সেসবের অনুপস্থিতি বোঝায়। কথা কমে যাওয়া, সরাসরি চোখের দিকে তাকিয়ে কথা না বলা, কোনো বিষয়ে আগ্রহ নেই, উৎসাহ নেই, লক্ষ্যহীন, আবেগের প্রকাশ নেই, এলোমেলো, ছন্নছাড়া একটা অবস্থা বোঝায়।

অবসাদের সাথে এমন লক্ষণের মিল থাকলেও এখানে রোগী আর পাশের মানুষটির মাঝে যেন একটা অদৃশ্য কাঁচের দেয়াল রয়েছে বলে মনে হয়। যদিও উদ্বেগ, অবসাদ, বিরক্তি, এমন লক্ষণ সিজোফ্রেনিয়াতেও থাকে, যাদের **''অ্যাফেকটিভ সিম্পটমস্''** বলা হয়।

এছাড়াও থাকে **''অ্যাগ্রেসিভ লক্ষণ''**। ডিল্যুশন বা হ্যালুসিনেশনের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাবেও কখনও কখনও রোগী আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে।

সবচেয়ে মারাত্মক হলো **কগনিটিভ সিম্পটমস্**। মনঃসংযোগ থেকে শুরু করে সমস্যা সমাধানের জন্য যাবতীয় পথগুলোই যেন অসংলগ্ন হয়ে যায় এখানে।

চিকিৎসার সাথে সাথে অন্যান্য লক্ষণ কমলেও নেগেটিভ এবং কগনিটিভ লক্ষণ গুলি দীর্ঘস্থায়ী হয়।

DSM শ্রেণীবিন্যাস পদ্ধতিতে কতদিন ধরে এবং কোন কোন রোগ লক্ষণ উপস্থিত, সেসবের ভিত্তিতে কাছাকাছি ধরনের সাইকোসিস গুলোকে

এক ছাতার তলায় ''সিজোফ্রেনিয়া স্পেকট্রাম ডিসঅর্ডার'' নামে বর্ণনা করা হয়, যার প্রথম রোগটাই সিজোফ্রেনিয়া। এখানে এই রোগের আর কোনো ভাগ যোগ না থাকলেও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার শ্রেণীবিন্যাস ICD-10 এ সিজোফ্রেনিয়ার বেশ কয়েকটি সাবটাইপের বিবরণ আছে। মোটামুটিভাবে সেগুলো এরকম—

১) প্যারানয়েড,

২) হেবিফ্রেনিয়া,

৩) ক্যাটাটনিক,

৪) আনডিফারেনসিয়েটেড,

৫) রেসিডুয়াল এবং

৬) পোস্ট সিজোফ্রেনিক ডিপ্রেশন।

ব্লিউলার এর করা সিম্পল সিজোফ্রেনিয়া ভাগটাও আছে সেখানে।

কি ধরনের সিজোফ্রেনিয়া হয়েছে সেটা নির্ণয় করতে পারলে চিকিৎসার ফলাফল কোন দিকে যেতে পারে চিকিৎসক দের পক্ষে সেটা বোঝা সহজ হয়।

প্যারানয়েড সিজোফ্রেনিয়ার কথাই ধরা যাক।

বছর তিরিশের সুকল্যাণ আই টি সেক্টরে কাজ করত। কিছুদিন থেকে তার মনে হচ্ছিল উল্টোদিকের ডেস্কে বসে থাকা চয়ন তার ওপর নজর রাখছে। সুকল্যাণ লক্ষ্য করেছে যখনই সে ল্যাপটপ থেকে চোখ তোলে, ঠিক তখনই চয়ন অপ্রস্তুত হয়ে ওর ওপর থেকে চোখ সরিয়ে নেয়। সুকল্যাণের কাজে ভুল হচ্ছে, একটা জরুরি প্রোজেক্টে বাধ্য হয়েই অন্য লোক জুড়তে হয় ওর বস্ কে। ক'দিন অফিস যাওয়া বন্ধ করে সুকল্যাণ। বরাবরের কাজপাগল ও, ঘরে বসে থাকায় বাবা মা অবাক হয়ে গেলেও ভাবেন, কি জানি, ডিপ্রেশন টিপ্রেশন নাকি!

মন ভালো করতে ছেলেকে এনে বসান টিভির সামনে। কিছুক্ষণ পর ভীষণ উত্তেজিত হয়ে যায় সুকল্যাণ। টিভিতে তো তাকে নিয়েই খবর পড়ছে! বাবা বোঝানোর চেষ্টা করলে আরো রেগে যায় ছেলে—তোমরা বুঝবে না, যে লোকটা খবর পড়ছে, ওর হাসি, চোখের ইশারায় যা বোঝার বুঝে নিয়েছি আমি!

সেই রাত থেকেই আরও উন্মত্ত ছেলে। জানলা দরজা খুলতে দেবেনা, বাড়ির বাইরে বেরোতে দেবেনা কাউকে, কারা নাকি নজর রাখছে, ফিস্ ফিস করে কথা বলছে সারা রাত।

অবশেষে ডাক্তার, ভর্তি করতে হয় সুকল্যাণ কে।

এ হলো প্যারানয়েড সিজোফ্রেনিয়া, ঠিক সময়ে চিকিৎসা হলে যার পরিণতি ততটা খারাপ নয়।

হেবিফ্রেনিয়া বা ডিসঅর্গানাইজড সিজোফ্রেনিয়া আবার অন্যরকম। দৃঢ় বিভ্রান্তি (delusion) কিম্বা অলীক দর্শন অথবা শ্রবণ (hallucinations) এখানে প্রায় অনুপস্থিত। যদিও রোগী বা রোগিনীর আচরণে যে পরিবেশ বা পরিস্থিতিতে সে রয়েছে তার সাথে সামঞ্জস্য থাকেনা। কথা বলতে বলতেই খিলখিলিয়ে হাসি, এক প্রসঙ্গ থেকে আরেক প্রসঙ্গে আকস্মিকভাবে ঢুকে পড়া, ভয় এবং সামগ্রিক ভাবেই চারপাশের দুনিয়া থেকে তার বিচ্ছিন্নতাটুকু স্পষ্ট বোঝা যায়।

সংখ্যায় কম দেখা গেলেও **ক্যাটাটনিক সিজোফ্রেনিয়া** আবার অন্যরকম। এখানে চারপাশের পরিবেশের কোনো কিছুই যেন স্পর্শ করে না রোগীকে। তাই ঘন্টার পর ঘন্টা খাওয়া দাওয়া বন্ধ করে, এমনকি জল অবদি পান না করেও একজায়গায় নিশ্চল দাঁড়িয়ে থেকে যায় রোগী বা রোগিণী।

এছাড়াও আরও কিছু ভাগযোগ এবং প্রকরণ থাকলেও সিজোফ্রেনিয়ার আসল বিপদ এর ক্রনিসিটি বা দীর্ঘস্থায়িত্ব।

আর এই স্থায়িত্ব নির্ভর করে কত তাড়াতাড়ি রোগটি নির্ণয় হচ্ছে এবং চিকিৎসা শুরু হচ্ছে। এর পরের ধাপটি হলো, লেগে থাকা। সিম্পটমস্ একটু নিয়ন্ত্রণে এলেই অনেকে ওষুধ বন্ধ করে দেন। ঘুম বাড়ছে, মোটা হয়ে যাচ্ছে, কাজ করতে পারে না, ইত্যাদি যাইই হোক না কেন, চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া কিচ্ছু করবেন না। বিয়ে দিয়ে দিলে রোগ ভালো হয়ে যাবে, এমন আজগুবি ধারণাতেও কান দেবেন না।

তাহলে, কতদিন ওষুধ খাইয়ে যেতে হবে? সারাজীবন!

এই প্রশ্নটা লোকে কার্ডিয়াক সমস্যায় করেন না, হাইপো-থাইরয়েডিজমে ভুগলেও না। এক্ষেত্রে করেন, তার কারণ মনের রোগ বিষয়টাকে আপদবালাই হিসেবে দেখি আমরা। এড়িয়ে যেতে চাই। রোগের প্রমাণ যদি ওষুধ চালিয়ে যাওয়া হয়, তাহলে ওষুধ বন্ধ করে দেওয়ার অর্থ নিশ্চিত রোগটাকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া! নইলে যে বিয়ে দেওয়া যাবেনা, অফিসে কাজ করবে কিভাবে?

সিজোফ্রেনিয়ার প্রোগনসিস বা পরিণতির কথাটা ভাবলে দেখা যাবে, এই রোগে অন্তত এক তৃতীয়াংশ রোগী যথেষ্ট ভালো থাকেন। ওষুধ চলার কিছুদিনের মধ্যেই তাঁদের কোনো রোগ লক্ষণই অবশিষ্ট থাকে না।

আরও এক তৃতীয়াংশ রোগী ওষুধ খেয়ে কাজ চালানোর মতো ভালোই থাকেন। দু চারটে রোগ লক্ষণ নিয়েও যথেষ্ট ভালো থাকেন তাঁরা। কাজকর্মে থাকেন, সংসারেও চলনসই বেশ।

শেষ এক তৃতীয়াংশের পরিণতি ভাল নয়। এঁদের রোগ লক্ষণের বাড়াবাড়ি, তীব্রতার ওঠানামা, সামাজিক সম্পর্কের অসামঞ্জস্য এবং সর্বোপরি একটা ভারসাম্যের অভাব, সিজোফ্রেনিয়া রোগটার ভয়াবহতা এবং হতাশার ছবিটা মেলে ধরে আমাদের সামনে।

রোগ চিকিৎসা বিষয়ে কয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন।

যে কোনো রোগেরই কারণ এবং চিকিৎসা, দুদিকেই অন্তত তিনটি দিক থাকে—প্রথমটি, জৈবিক বা বায়োলজিক্যাল, দ্বিতীয়টি, মানসিক শক্তি, মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা, ব্যক্তিত্বের গড়ন, এইসব।

তৃতীয়টি, সামাজিক, পারিবারিক এবং পরিবেশের। যাকে আপনি সোস্যাল সাপোর্ট ধরতে পারেন।

সব অসুখে সব দিক একইভাবে না-ও থাকতে পারে। তাই, চিকিৎসারও তিনটি দিক—

১) বায়োলজিক্যাল, মানে ফার্মাকোথেরাপি। ওষুধ প্রয়োগে যে চিকিৎসা হয়।

২) সাইকোথেরাপি—কথা বার্তার মাধ্যমে রোগীকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার পদ্ধতি এটি।

৩) সোসিওথেরাপি—সিজোফ্রেনিয়ার মতো অসুখে সমাজে চলার মতো, মেলামেশা করার ক্ষমতা হারায় মানুষ। উপরক্ত, রোগীকে বোঝা হিসেবে দেখা, অকর্মণ্য হিসেবে দেখার ফলে আত্মপ্রত্যয় এবং আত্মমূল্যের তলানিতে পৌঁছে যায় অনেকেই।

এখানেই প্রতিবেশের ভূমিকা।

ষাট সত্তর বছর আগে সিজোফ্রেনিয়া রোগটার তেমন কোনো ওষুধই ছিল না। সারা দুনিয়ার প্রথম অ্যান্টিসাইকোটিক মেডিসিন আবিষ্কারের চেষ্টা আমাদের শহর কলকাতায় হলেও, গত শতকের মাঝামাঝি এর সার্থক রূপায়ণ হয় "ক্লোরপ্রোমাজিন" নামের ওষুধের মাধ্যমে। তারপর অনেক ওষুধ এসেছে। প্রথম দিকের ওষুধে ডিল্যুসন বা হ্যালুসিনেশন জাতীয় পজিটিভ সিম্পটমস্ গুলো কমলেও নেগেটিভ সিম্পটমস্ এর উপর এদের বিশেষ কোনো প্রভাব

পড়ত না। সাইড এফেক্টসও যথেষ্ট ছিল। উত্তরোত্তর নতুন নতুন ওষুধের আবিষ্কার আজকের যুগে সিজোফ্রেনিয়া রোগটার চিকিৎসা অনেক সুগম করেছে। নতুন ওষুধেরও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া আছে বটে, কিন্তু আসল জিজ্ঞাসা হলো সফল জীবনের প্রতিশ্রুতি নির্মাণে এদের ভূমিকায়।

সেটা অবশ্যই হয়েছে।

যদিও বারবার মাঝপথে চিকিৎসা বন্ধ হয়ে যাওয়া, নানারকম বাধাবিপত্তি প্রায়ই চিকিৎসার আশাব্যঞ্জক দিকটাতে বিঘ্ন ঘটায়।

এ নিয়ে ভাবার সময় এসেছে।

সিজোফ্রেনিয়ার আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, রোগ লক্ষণ চলে যাওয়ার পরেও সামাজিক ভাবে মানুষটি স্বাভাবিক হতে পারেন না। ফলে যোগ্যতার নিরিখে যে কাজটি তাঁর অনায়াসে করা সম্ভব, সেটি করতেও নড়বড় করে থাকেন। সোস্যাল স্কিল ডেভেলপমেন্ট এবং এ জাতীয় নানান পদ্ধতিতে এর অনেকটা ফিরিয়ে আনা যায়।

যেহেতু সিজোফ্রেনিয়া রোগটা একটি মেজর মেন্টাল ডিসঅর্ডার, প্রায় সময়েই যা ক্রনিকও বটে, তাই চাইলেই এটা চলে যাবেনা, তাগা তাবিজ, মাদুলিতেও কিছুই হবেনা -- প্রয়োজন রোগটার যত দ্রুত সম্ভব চিকিৎসা শুরু হওয়া এবং অবিচ্ছিন্ন ভাবে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী তা চালিয়ে যাওয়া।

সার্বিক ভাবে যা মনে রাখার

১) সিজোফ্রেনিয়া মস্তিষ্কের একটা অসুখ, দেব দৈব ইত্যাদির সঙ্গে যার কোনো যোগাযোগ নেই। মস্তিষ্কেরই কয়েকটি নিউরোট্রান্সমিটারের ওঠানামা এর আড়ালে। এছাড়াও আছে ডেভেলপমেন্টাল এবং জেনেটিক কারণ।

২) সারা পৃথিবীতেই রোগটা হয়। শুনলে অবাক লাগবে, তথাকথিত উন্নত দেশগুলোর তুলনায় অপেক্ষাকৃত অনুন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশেই এর পরিণতি বেশি ভালো।

৩) ওষুধ তো আছেই, তবে ওষুধের বাইরে একটা যত্ন চাই, অবহেলা নয়, মনোযোগ চাই। তবেই সার্বিক উন্নতি হবে মানুষটার। বিয়ে দিয়ে ঘাড় থেকে নামানো নয়, উপযুক্ত লেখাপড়া আর কাজের মধ্যেই আপনার পরিবারের সদস্যটি আবার ঘুরে দাঁড়ানোর সুযোগ পাবেন।

অধ্যাপক ডা. গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভাগীয় প্রধান, সাইকিয়াট্রি, কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ

উৎকণ্ঠার বিচিত্র রূপ

ডা. সৈকত বৈদ্য

মনের আকাশে কখনো উৎকণ্ঠার মেঘ জমেনি এমন মানুষ ইহজগতে খুঁজে পাওয়া যাবে না। মাত্রা ও ব্যপ্তি অনুসারে উৎকণ্ঠাকে কখনো স্বাভাবিক আবার কখনো অস্বাভাবিক হিসাবে গণ্য করা হয়। পরীক্ষা বা ইন্টারভিউয়ের আগে ঘনঘন বাথরুমে ছোটা, ঘুম না আসা, মাথা ধরা কিংবা আপনজনের কঠিন অসুখের সময় উৎকণ্ঠা—এমন হাজারো উৎকণ্ঠা মানুষের দোসর জীবনভর। এই উৎকণ্ঠা অবস্থা (Anxiety state) যখন বায়ুরোগের (Anxiety neurosis) পর্যায়ে পড়ে তখন এর স্থায়িত্ব, ব্যপ্তি ও গভীরতা হয় অনেক বেশি। এটি আক্রান্ত ব্যক্তিকে দৈনন্দিন কাজে, চিন্তায় ও ভাবনায় অধিকতর অকর্মণ্য করে তোলে। উৎকণ্ঠা হঠাৎ কোন বিশেষ ঘটনাকে কেন্দ্র করে দেখা দিতে পারে আবার অনেকদিন ধরে অজানা কোন আশঙ্কায় মনের মধ্যে ছাইচাপা আগুনের মতো ধিকিধিকি জ্বলতে পারে।

উৎকণ্ঠার কারণ

মানসিক কারণ: মনঃসমীক্ষকেরা ভয় (Fear) ও উৎকণ্ঠাকে (Anxiety) আলাদা করে দেখেন। ভয়ের উৎপত্তি বাইরের কোন বস্তুকে কেন্দ্র করে। অর্থাৎ ভয় হলো বস্তুসাপেক্ষ (Objective) যেমন: সাপের ভয়, ভূতের ভয়, বাঘের ভয় ইত্যাদি। কিন্তু উৎকণ্ঠার উৎপত্তিস্থল হলো মনের গভীরতর প্রদেশে অর্থাৎ মনের নির্জ্ঞান স্তর (Unconscious mind) থেকে। তাই উৎকণ্ঠা হলো পাত্রসাপেক্ষ (Subjective)। উৎকণ্ঠার মূলকারণ নিহিত রয়েছে মনের অন্তঃস্থিত বিবেকসত্তা বা অধিসত্তা বা Superego-তে। মানুষের নির্জ্ঞান মনস্তরে সঞ্চিত কামনা, বাসনা, ভীতি যখন অবদমনের বাধা ভেঙে সজ্ঞান মনে (Conscious mind) চলে আসে তখনই মানসিক দ্বন্দ্ব ও সংঘাতে উৎকণ্ঠার সৃষ্টি হয়।

উৎকণ্ঠার কারণ হিসাবে মনোবিজ্ঞানে মোটামুটি নিম্নোক্ত চারটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়:

১) বিবেকের দংশনে অন্যায় ও পাপবোধ

২) দেহসংক্রান্ত নানারকম ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা

৩) প্রিয়জনের অমঙ্গল বা বিয়োগের আশঙ্কা

৪) আত্মবিশ্বাস ও সংযম হারিয়ে যাওয়া

Freud (ফ্রয়েড) মনে করেন উৎকণ্ঠা ব্যক্তির যৌনজীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এটি তখনই সৃষ্টি হয় যখন একদিকে রয়েছে অতিরিক্ত যৌন উদ্দীপনা কিন্তু অপরদিকে রয়েছে তার স্বাভাবিক পরিণতি, পূর্ণতা ও পরিতৃপ্তির অভাব। এই অন্তর্মানস দ্বন্দ্বই (Intrapsychic conflict) হলো উৎকণ্ঠার আঁতুড়ঘর।

ফ্রয়েডের দ্বিতীয় মতবাদ হলো, মানুষের জীবনে ভবিষ্যতে যে বিপদ আসছে পূর্বাহ্নে সেই বিপদ সম্পর্কে সজাগ হয়ে ওঠাই উৎকণ্ঠার কারণ। মনের গভীর থেকে সজ্ঞান বা চেতন মনে আসতে থাকে ভবিষ্যতের সম্ভাব্য বিপদের সংকেত। বাইরে তারই প্রকাশ দেখা যায় উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা আর মর্মপীড়ায়।

ফ্রয়েডের তৃতীয় মতবাদ হলো Castration complex। প্রত্যেক শিশুই তার একটা বিশেষ বয়সে ভয় পেতে থাকে যে তার মহামূল্যবান যৌনাঙ্গ বা উপস্থ ছেদন করে শাস্তিবিধান করবেন তার বাবা কেননা মায়ের প্রতি তার অবৈধ আসক্তি তিনি টের পেয়ে গেছেন। একে বলে castration anxiety. এভাবেই শিশুর অবেচতন মনে অবদমিতভাবে উপস্থচ্ছেদের গুঢ়ৈষা বা লিঙ্গচ্ছেদের ভয় বাসা বাধে। ভবিষ্যতে যখনই কোন ব্যক্তির কোন মূল্যবান বস্তু, ধ্যান-ধারণা বা ভালোবাসার পাত্রকে হারাবার আশঙ্কা দেখা দেয় তখনই তার মনের গভীরে লিঙ্গচ্ছেদের গুঢ়ৈষা বা ভয় দেখা দেয়, আর চেতন মনে দেখা দেয় উৎকণ্ঠা।

মনোবিজ্ঞানী ওটো র‍্যাঙ্ক-এর উৎকণ্ঠা সম্বন্ধীয় মতবাদ বিশেষ আকর্ষণীয়। তিনি বলেন গর্ভস্থ শিশু মাতৃজঠরে স্বর্গসুখে বাস করে। কিন্তু জন্মক্ষণে তাকে নরকযন্ত্রণা ভোগ করতে হয় এবং যখন নাড়ি কেটে মায়ের সঙ্গে শেষ প্রত্যক্ষ যোগাযোগও ছিন্ন করা হয় তখন শিশুর মনে মাতৃবিচ্ছেদ ও স্বর্গসুখ হারানোর জন্য উৎকণ্ঠা দেখা দেয়। প্রত্যেক মানুষের জীবনে এটাই উৎকণ্ঠার প্রথম অনুভূতি। পরবর্তীকালে যখনই কোন বিচ্ছেদের সম্ভাবনা কিংবা মূল্যবান বস্তু বা ধ্যান-ধারণা হারিয়ে ফেলবার আশঙ্কা দেখা যায় তখনই সে উৎকণ্ঠাগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

জৈবিক কারণ: মস্তিষ্কের মধ্যে বিভিন্ন রাসায়নিক যেমন গামা-অ্যামাইনো বিউটারিক অ্যাসিড (GABA), সেরোটোনিন, নরঅ্যাড্রিনালিন, ডোপামিন, গ্লুটামেট প্রভৃতি নিউরোট্রান্সমিটারের মাত্রার তারতম্যে উৎকণ্ঠার সৃষ্টি হয়।

উৎকণ্ঠার সঙ্গে ব্যক্তিত্বের ধরনের সম্পর্ক: সাধারণতঃ তিনশ্রেণীর মানুষকে বেশি উৎকণ্ঠার স্বীকার হতে দেখা যায়:

১) একদল মানুষ থাকেন যারা খুবই উচ্চাকাঙ্খী, বিবেকবান, উৎসাহী ও কর্মযোগী। এরা জীবনের লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। কিন্তু যদি জীবনে চলার পথে কোন অন্তর্দ্বন্দ্ব কিংবা তাপ-চাপ মাত্রারিক্তভাবে বেড়ে যায় তখন এরা তার সঙ্গে সর্বোতভাবে সাযুজ্য রেখে চলতে চেষ্টা করেও যখন ব্যর্থ হন তখন বিফলমনোরথ হয়ে উৎকণ্ঠার স্বীকার হন।

২) এই শ্রেণীর মানুষেরা বিশেষভাবে পরনির্ভরশীল এবং চিন্তায়-ভাবনায়-অনুভূতিতে অপরিপক্ক। এরা কখনোই বয়সোচিত দায়-দায়িত্ব নিতে চান না। সামান্যতম দায়বদ্ধতার ভারেই এরা ন্যুব্জ হয়ে পড়েন ও উৎকণ্ঠার স্বীকার হন।

৩) তৃতীয় দলের মানুষেরা যেকোন অপূর্ণতাকে সে কর্মজীবনে হোক, যৌনজীবনে হোক কিংবা পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেই হোক-অতিশয় গুরুত্বের চোখে দেখেন। তাই পান থেকে চুন খসলেই এদের মনে দেখা দেয় নিরাপত্তাবোধের অভাব (Insecurity)। আর এখান থেকেই জন্ম হয় উৎকণ্ঠার।

উৎকণ্ঠার লক্ষণসমূহ

১) **দৈহিক:** উৎকণ্ঠার লক্ষণগুলিকে তিনটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করা যায়—Fight, Flight, Fright/Freeze (রণ-পলায়ন-ত্রাস)—হয় লড়ো, না হয় পালাও, নচেৎ ভয়ে জড়ভরতের মতো হয়ে থাকো। উৎকণ্ঠাবস্থা যেন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি। দেহের মাংসপেশীসমূহ দৃঢ় ও শক্ত হয়ে ওঠে। এরফলে মাথা ব্যথা, পিঠে ব্যথা, ঘাড় ব্যথা ও অন্যান্য স্থানে ব্যথা দেখা দেয়। রক্তসঞ্চালনের গতি বাড়ে। রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা বাড়ে; জরুরি অবস্থায় শরীরকে অতিরিক্ত জ্বালানির জোগান দেওয়ার জন্য। হৃদযন্ত্রের গতি বাড়ে ও বুক ধড়ফড় করে। চক্ষু বিস্ফারিত হয়, নিঃশাস দ্রুততর হয়। গলা জিভ শুকিয়ে আসে, তেষ্টা পায়, ক্ষুধামান্দ্য দেখা যায়। হাতের আঙ্গুল ও হাঁটু কাঁপতে থাকে। মনে হয় যে গলায় কিছু আটকে আছে। ঘন ঘন বাথরুম ছুটতে হয়। রাত্রে ঘুম আসতে চায় না। একবার ঘুমিয়ে পড়লে অনেকক্ষণ ঘুমিয়ে সতেজ অনুভূতি হয় শেষমেশ।

২) **মানসিক:** একটা মানসিক অস্থিরতা (Restlessness) গ্রাস করে। ভয়, আশঙ্কা, চাপা উত্তেজনা, ভবিষ্যতের বিপদের হাতছানি মনের উপর

কালো ছায়া ফেলে। কাজে উদ্যমহীনতা দেখা যায়। মেজাজ হয়ে ওঠে তিরিক্ষি। কারো কোন কথা সহ্য হয় না, নিজে নিজেও কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারে না। কোন কিছুতে মন বসে না। নিজের বা বাড়ির অন্যসকলের স্বাস্থ্যকে কেন্দ্র করে অযথা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়। অনেক তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয় নিয়েও অনেক সময় অতিরিক্ত দুর্ভাবনা করে। মনে করে সে যেন কোন খাদের কিনারে দাঁড়িয়ে আছে। ভাবে সে বুঝি এবার পাগলই হয়ে যাবে। নানা চিন্তার ভারে সে অবসন্ন হয়ে পড়ে।

উৎকণ্ঠার প্রকারভেদ

১) সাধারণ উৎকণ্ঠাজনিত রোগ (Generalized anxiety disorder)ঃ জনগোষ্ঠীর বৃহত্তম অংশই এই ধরনের উৎকণ্ঠায় ভোগেন। আকাশে মেঘ যেমন মুক্তভাবে ভেসে বেড়ায়। এদের উৎকণ্ঠার দুশ্চিন্তাও তেমনি মনের আকাশে ইতস্তত ও মুক্তবিচরণশীল (Free floating anxiety)। উৎকণ্ঠার বিষয়বস্তুও ক্রমান্বয়ে পাল্টে পাল্টে যেতে থাকে।

২) **সামাজিক ভীতি** (Social anxiety disorder)ঃ কোন সামাজিক অনুষ্ঠানে অনেক মানুষের সামনা-সামনি হওয়া, মঞ্চে উঠে বক্তৃতা দেওয়া বা Perform করা কিংবা সকলের সামনে খাওয়ার সময় এরা তীব্র উৎকণ্ঠায় ভোগেন। এরা ভাবেন সবার নজর শুধু এদের দিকেই থাকে এবং সবাই এদের খুঁত কিংবা ভুলভ্রান্তি খোঁজার চেষ্টা করছে।

৩) **আতঙ্ক রোগ** (Panic disorder)ঃ এই রোগে হঠাৎ হঠাৎ তীব্র উৎকণ্ঠা দেখা দেয় এবং এর প্রাবল্য এত বেশি হয় যে রোগী ভাবে এখনই খুব খারাপ কিছু হয়ে যাবে, এমনকি সে মারাও যেতে পারে (Fear of impending doom)। প্রচণ্ড বুক ধড়ফড়ানিতে ঘেমে নেয়ে একসার হয়ে বুক চেপে ধরে ডাক্তারের চেম্বারে ECG করাতে ছোটে, এমনকি সটান ICCU-তে অবাধে প্রবেশ করে যায় মুখে Oxygen mask লাগিয়ে। মনে রাখতে হবে বিশেষ কোন কারণ ছাড়াই (out of the blue) এই আতঙ্ক আক্রমণ (Panic attack) হতে পারে। তবে এর স্থায়িত্ব বেশীক্ষণ হয় না। কালবৈশাখী ঝড়ের মতো চকিতে এসে মনের অরণ্যে আলোড়ন তুলে অদৃশ্য হয়ে যায়। Panic attack বারবার হতে থাকলে তখন তা Panic disorder নাম ধারণ করে।

৪) অমুলক ভয় (Phobia)ঃ এই রোগে এক একটা বস্তু বা অবস্থাকে কেন্দ্র করে রোগীর মনে অসম্ভব ভয় ও আতঙ্ক দেখা যায়। যেমন খোলা

জায়গায় একা যেতে ভয় (Agoraphobia), বদ্ধ জায়গার ভয় (Claustrophobia), অন্ধকারের ভয় (Nyctophobia), উচ্চস্থানের ভয় (Acrophobia), আরশোলার ভয় (Katsaridaphobia), বজ্রপাতের ভয় (Astraphobia), ইনজেকশানের ভয় ইত্যাদি ইত্যাদি। এসকল অবস্থায় বা বস্তুর সান্নিধ্যে রোগী অস্থির, বিব্রত ও সন্ত্রস্ত বোধ করে এবং সত্বর ঐ অবস্থা বা বস্তু থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে কিংবা এড়িয়ে চলার চেষ্টা করে।

৫) **বিচ্ছেদের আশঙ্কাজনিত উৎকণ্ঠা** (Separation anxiety): এখানে রোগী স্বজন থেকে বিচ্ছেদের ভয়ে সদাসর্বদা তটস্থ থাকে। স্বজনের যদি কোন রোগ-ভোগ হয়, দুর্ঘটনা হয়, কেউ যদি অপহরণ করে নিয়ে যায়, তাহলে এই বিশাল পৃথিবীতে সে একেবারে একা হয়ে যাবে—এই অজানা আশঙ্কা তাকে কুরে কুরে খায়। তাই বাড়ির ঘরোয়া পরিবেশের নিশ্চিন্ত ঘেরাটোপ (Comfort Zone) থেকে সে বেরোতে চায় না। ক্রমশ সে ঘরকুনো (Homesick) হয়ে যায়। বাড়ি ছেড়ে অন্য কোথাও গেলে তার ঘুম হয় না, হলেও ঘুমের মধ্যে সর্বজনদের থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার দুঃস্বপ্ন দেখে।

৬) নির্বাচক নীরবতা (Selective Mutism): এটি সাধারণতঃ শিশুদের মধ্যে দেখা যায়। এরা নিজের ঘরে-দোরে বাবা-মা কিংবা পরিবারের একান্ত নিকট সম্পর্কিত সদস্যদের (Immediate family members) সঙ্গে দিব্যি কথা বলে। কিন্তু পরিচিত নয় এমন মানুষদের সামনে অথবা নতুন ধরনের পরিবেশে (যেমন-স্কুলে) একেবারেই মুখে কুলুপ এঁটে রাখে। এরা অতিশয় স্বভাব-লাজুক হয়। কথা না বলে এরা অনেক সময় হাতের আঙুল দিয়ে ইশারা করে, লিখে কিংবা মুখে বিশেষ শব্দ করে বোঝানোর চেষ্টা করে যে কি বলতে চাইছে।

উৎকণ্ঠার চিকিৎসা

ওষুধ (Medication):

১) **অ্যান্টিডিপ্রেস্যান্টস্** (SSRI/SNRI প্রভৃতি): এগুলো প্রথমসারির ওষুধ যা উৎকণ্ঠার জন্য দায়ী মস্তিষ্কের রাসায়নিকগুলির ভারসাম্য রক্ষা করে।

২) **অ্যানসিওলাইটিকস্** (Benzodiazepine, Buspirone ইত্যাদি): ওগুলোও প্রয়োজনমত ব্যবহার করা হয়।

৩) বুকের ধড়ফড়ানি বন্ধ করতে ব্যবহৃত হয় Propranolol জাতীয় ওষুধ।

মনোচিকিৎসা (Psychotherapy)

১) **কগনিটিভ বিহেভিওরাল থেরাপি** (CBT): এটি স্বয়ংক্রিয় নঞর্থক চিন্তাগুলিকে (Automatic negative thoughts) সদর্থক দিকে চালিত করে তদনুসারে আচরণ পরিবর্তন করতে শেখায়, যা উৎকণ্ঠার নিরসনে খুবই কার্যকর।

২) **গ্রেডেড এক্সপোজার থেরাপি** (Graded exposure therapy): এতে রোগীকে ধীরে ধীরে উৎকণ্ঠা সৃষ্টিকারী কারণগুলির মুখোমুখি করানো হয়—এর ফলে উৎকণ্ঠাজনিত শারীরিক ও মানসিক প্রতিক্রিয়াগুলি ক্রমশ ভোঁতা হয়ে আসে।

৩) **অন্যান্য থেরাপি:** মাইন্ডফুলনেস ভিত্তিক থেরাপি ও রিলাক্সেশন ট্রেনিং (প্রাণায়াম, ধ্যান, Progressive muscle relaxation) খুবই কার্যকর।

ওষুধের সঙ্গে মনোচিকিৎসার সম্মিলিত প্রয়োগ (combined therapy) অনেক সময়-ই অধিকতর ফলপ্রসূ হয়।

জীবনযাত্রার পরিবর্তন ও ঘরোয়া উপায়ে উৎকণ্ঠামুক্তি

১) প্রতিদিন নিয়ম করে হাঁটা, দৌঁড়ানো, সাঁতার কাটা বা সাইকেল চালানো।

২) সুষম খাবার খাওয়া। চা-কফি কম খাওয়া, ফল ও সবুজ শাকসব্জী বেশি বেশি খাওয়া।

৩) যে কোন নেশার দ্রব্য থেকে দূরে থাকা।

৪) মোবাইল সহ অন্যান্য ইলেকট্রনিক গ্যাজেটের নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার।

৫) পর্যাপ্ত ঘুমানো।

৬) বন্ধু, পরিবার বা বিভিন্ন সাপোর্ট গ্রুপের সঙ্গে নিজেকে সম্পৃক্ত রাখা।

৭) নিজের কোন Hobby থাকলে তার চর্চা করা।

উৎকণ্ঠার নিরসনে কখন চিকিৎসকের পরামর্শ প্রয়োজন

ক্রমাগত উৎকণ্ঠা যখন একজন মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় পেশাগত, পারিবারিক, সামাজিক কিংবা জীবনের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলিকে প্রভাবিত করে ক্ষতিগ্রস্ত করতে শুরু করে তখন অবশ্যই মনোরোগ বিশেষজ্ঞ (Psychiatrist) বা মনোবিদের (Psychologist) পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন।

ডা. সৈকত বৈদ্য, আর. এম. ও কাম ক্লিনিকাল টিউটর, কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ

অবসেসিভ-কম্পালসিভ ডিসঅর্ডারঃ মন ও আচরণের দ্বন্দ্ব

ডা. শুভেন্দু দত্ত

মন একটা নদীর মতো। জলের স্রোতের মতো সারাক্ষণ আশা, নিরাশা, ভয়, স্মৃতি, বিস্মৃতির প্রবাহ চলতে থাকে। মাঝে মাঝে ঘূর্ণির মতো আসে কিছু চিন্তা। ঘূর্ণির মতো সে পাক খেতে থাকে। বারে বারে ফিরে আসে, চাইলেও মুক্তি মেলে না। মন তখন নিজের চিন্তার মধ্যেই বন্দী হয়ে পড়ে। আর এই মানসিক বন্দীত্বের আর এক নাম অবসেসিভ-কম্পালসিভ ডিসঅর্ডার সংক্ষেপে যাকে বলে OCD।

চিন্তা আমাদের কর্মপন্থা স্থির করে। এই চিন্তাগুলি ধীরে ধীরে আমাদের মন এবং সর্বোপরি আমাদের কর্মের গতি নির্ধারণ করে। প্রাধান্য বিস্তার করে আমাদের উপর। চলার পথ সংকীর্ণ হতে হতে একটি সীমার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে যায়।

এই রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির বোধ থাকে যে চিন্তাগুলো অপ্রয়োজনীয়, ভয় অমূলক। তা সত্ত্বেও বারে বারে চিন্তাগুলো ফিরে আসে। নিষ্কৃতি মেলার চেষ্টা করলেও মুক্তি মেলে না। এই চিন্তা আর এর থেকে সৃষ্ট ভয় অনাকাঙ্খিত। তাই চলে এক অসম লড়াই। উপেক্ষা যেখানে অসম্ভব সেখানে জন্ম নেয় উদ্বেগ। এই উদ্বেগ প্রশমনের জন্য মন বেছে নেয় নির্দিষ্ট কিছু কাজ করতে। আপাত স্বস্তি মিললেও অন্তর্দ্বন্দ্ব থামে না। সময়ের সাথে খাপ খাওয়াতে না পেরে জীবন থমকে যায়। পথ আরও জটিল হতে থাকে।

আধুনিক সমাজে উত্তরোত্তর মানসিক চাপ, প্রতিযোগিতা আর অনিশ্চয়তার মাঝে OCD একটি বড় সমস্যা। কিছু ভ্রান্ত ধারণা আর লজ্জা আমাদের এই যন্ত্রণাকে নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে বাধ্য করে। পরিশেষে এর প্রভাব শুধু ব্যক্তির মধ্যে সীমিত না থেকে ছড়িয়ে পড়ে পরিবার ও সমাজে।

এই অধ্যায়ে আমরা OCD কে শুধু মানসিক অসুখ হিসেবে না দেখে নিদারুণ বাস্তবের আলোকে রোগী ও তার পরিবারের মানসিক অবস্থাকে অনুধাবন করার চেষ্টা করব। সামাজিক প্রতিবন্ধকতাকে দূরে সরিয়ে রেখে

মানবিকতার সাথে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে OCD নামক রোগটিকে পর্যালোচনা করব।

OCD র সংজ্ঞা

অবসেসিভ কম্পালসিভ ডিসঅর্ডার (OCD) একটি দীর্ঘস্থায়ী মানসিক ব্যাধি। আক্রান্ত ব্যক্তি বার বার একটি চিন্তা করতে বাধ্য হয়। যদিও চিন্তাটি অনিচ্ছাকৃত এবং অপ্রয়োজনীয়, কিন্তু এর নিয়ন্ত্রণ আক্রান্ত ব্যক্তির হাতে থাকে না। জন্ম নেয় উদ্বেগ আর তাকে প্রশমনের জন্যই ব্যক্তি নির্দিষ্ট কিছু কাজ বা আচরণ করতে বাধ্য হয়।

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 5 (DSM 5) অনুযায়ী OCD এমন এক অসুখ যেখানে ব্যক্তির দৈনন্দিন জীবন থমকে দাঁড়ায়, আর সে তীব্র এক মানসিক যন্ত্রণার শিকার হয়।

অবসেশনের (Obsession) ধারণা

অবসেশন হল বারংবার একই মানসিক চিন্তা বা কল্পনা যা ফিরে ফিরে আসে। অনিচ্ছাকৃত উদ্বেগের জন্ম দেয়।

উদাহরণ: ১. জীবাণু বা সংক্রমণের ভয়

২. সবকিছু নিখুঁত ভাবে করার এক অবিরাম প্রচেষ্টা

৩. নিজের বা নিকট কারো ক্ষতি করে ফেলার ভয়

৪. ধর্ম বা ইশ্বরের নিন্দা বা অবমাননা করে ফেলার চিন্তা

কম্পালশনের (Compulsion) ধারণা

কম্পালশন হল কিছু বাহ্যিক কাজ বা মানসিক আচরণ যা ব্যক্তি অবসেশন থেকে উদ্ভূত উদ্বেগ প্রশমনের জন্য বার বার করতে থাকে।

* পুনরাবৃত্ত হয়
* নিয়ম মেনে করতে হয়
* সাময়িক স্বস্তিদায়ক

উদাহরণ:

১. বার বার হাত ধোয়া

২. দরজা জানালা বন্ধ আছে কিনা বার বার দেখা

৩. কিছু মানসিক প্রার্থনা বা আবৃত্তি করা।

OCD র প্রকারভেদ

১. জীবাণু সংক্রান্ত OCD: জীবাণু সংক্রমণের ভয় যা জন্ম দেয় উদ্বেগ। আর তা প্রশমনের উপায় হলো অবিরাম হাত ধোয়া বা অতিরিক্ত পরিচ্ছন্নতা।

২. পরীক্ষা সংক্রান্ত OCD: বিপদের আশঙ্কায় দরজার তালা, গ্যাস, বৈদ্যুতিন সামগ্রীর সুইচ বার বার পরীক্ষা করা।

৩. প্রতিসাম্যের OCD: নিখুঁত ভাবে কাজ বা জিনিস ঠিক রাখার চিন্তা। জিনিসের ক্রম বজায় রাখার নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াস।

OCD র কারণ:

মন কোন স্বাধীন সত্ত্বা নয়। এটি শরীর, পরিবেশ, অভিজ্ঞতা আর উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত বৈশিষ্ট্যের এক মিলন ক্ষেত্র। এটি কোন একটি কারণের জন্য সৃষ্টি হয় না । পরিবেশ, অভিজ্ঞতা আর কিছু জৈবিক ক্রিয়ার সংমিশ্রণে সৃষ্ট এক মানসিক অবস্থা । এই অসুখের কারণ অনুসন্ধান করতে গেলে তাই মানব মনের গভীরে অবগাহন করতেই হবে।

জৈবিক কারণ

মানুষের মস্তিষ্ক সবসময় কিছু রাসায়নিক আর স্নায়ুতন্ত্রের কার্যকারিতার প্রভাবে স্বাভাবিক ভাবে কর্মক্ষম থাকে। মস্তিষ্কের নির্দিষ্ট কিছু অংশ যেমন ফ্রন্টাল লোব, বেসাল গ্যাংলিয়া ও থ্যালামাসের কার্যকারিতার অসামঞ্জস্য দেখা দেয়। ফলে চিন্তা প্রবাহের গতি এবং প্রকৃতি দুইই প্রবাহিত হয়।

এছাড়া কিছু নিউরোট্রান্সমিটার যেমন সেরোটোনিনের অভাবে মনের স্বাভাবিক চিন্তা বিঘ্নিত হয়। এই জৈবিক কারণের প্রেক্ষাপট OCD কে শুধু মানসিক নয় বরং স্নায়ুতন্ত্রের এক জটিল ব্যাধির দিকেই ইঙ্গিত দেয়।

বংশগত প্রভাব

শারীরিক সম্পদের সাথে সাথে আমরা মানসিক সম্পদও উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হই।

পরীক্ষায় দেখা গেছে OCD আক্রান্ত ব্যক্তির পরিবারে পূর্ববর্তী প্রজন্মের মধ্যে OCD র ইতিহাস থাকে।

বংশগত প্রভাব একাকী কোন মানসিক রোগ তৈরি করতে না পারলেও এটি এমন এক ক্ষেত্র তৈরি করে যাতে জীবনের অভিজ্ঞতা সহজেই অসুখের বীজ বপন করে।

সামাজিক কারণ

আমরা পরিবেশ থেকে শিক্ষালাভ করি। পরিবেশ বা সমাজ থেকে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতাই চলার পথের পাথেয়। পারিবারিক বা সামাজিক রীতি নীতি অনুশাসনের ফল সুদূর প্রসারী। শৈশবের কিছু ঘটনা যা কঠোর অনুশাসন হোক বা কোন মানসিক যন্ত্রণা যা মানসিক অনিশ্চয়তার জন্ম দেয়। এই নিরাপত্তা হীনতা বা অনিশ্চয়তা থেকেই পরবর্তী জীবনে জন্ম দেয় OCD।

মনোবিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে

অবদমিত আবেগ আর অর্ন্তদন্দ্ব মনের এক নিভৃত স্থানে অবচেতন মনে জমা হয়ে থাকে, যা থেকে পরবর্তীতে OCD মহীরুহ আকারে দেখা দেয়।

OCD র প্রভাব

এটি শুধুমাত্র একটি মানসিক রোগ নয়। এটির প্রভাব বহুমাত্রিক। অবাঞ্ছিত কিছু চিন্তা আর বাধ্যতামূলক আচরণের জন্য সময়, কর্মক্ষমতা, ও সর্বোপরি মানসিক শান্তি সম্পূর্ণ রূপে বিঘ্নিত হয়।

১. ব্যক্তি জীবনে প্রভাব: নিত্য দিনের জীবন এক নিয়মের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। বার বার একই কাজের জন্য শুধু মূল্যবান সময়ের অপচয়ই হয় না বরং মানসিক ক্লান্তি ডেকে নিয়ে আসে। নিজের কাছে নিজের কাজগুলো শুধু বিরক্তিকরই নয় বরং মানসিক অবসাদ জন্ম নেওয়ার এক ক্ষেত্র প্রস্তুত করে।

২. মানসিক প্রভাব: ধীরে ধীরে মনের সবটুকু জায়গা জুড়ে থাকে OCD। তৈরী হয় উৎকণ্ঠা, হতাশা, হীনমন্যতা, অপরাধ বোধ ও আত্মগ্লানি।

৩. পারিবারিক ও সমাজ জীবনে প্রভাব: শুধু আক্রান্ত ব্যক্তিই নয় তার পরিবারও এই অসুখের দ্বারা প্রভাবিত হয়। আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে সাথে পরিবারের সদস্যদের মানসিক চাপ আর বিরক্তি উদ্রেক হয়। পরবর্তীতে আসে সম্পর্কের টানাপোড়েন। সামাজিক ভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে পড়তে সামাজিক সম্পর্কগুলিকে এড়িয়ে যাওয়া ও শেষে একেবারে নিঃসঙ্গতা গ্রাস করে ফেলে।

অনেক সময় কাছের লোকজনও অজান্তেই রোগীর অপ্রাসঙ্গিক ও অযৌক্তিক আচরণের অংশীদার হয়ে ওঠে।

৪. শিক্ষাগত ও পেশাগত জীবনঃ নির্দিষ্ট সময়ে কাজ শেষ করতে না পারা, সিদ্ধান্ত গ্রহণে অসুবিধা, সহকর্মীদের সাথে মনোমালিন্য পেশাগত জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে।

শিক্ষার্থীদের পড়াশুনায় অমনোযোগ, পরীক্ষার সময়ের ব্যবস্থাপনায় সমস্যা ও দৈনন্দিন জীবনে সময়ের অপ্রতুলতা সমস্যাকে বাড়িয়ে দেয় কয়েক গুণ।

৫. শারীরিক স্বাস্থ্যের উপর প্রভাবঃ মন তো শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। তাই মনের সমস্যায় শরীর ভালো থাকতে পারে না। অতিরিক্ত হাত ধোয়ার ফলে ত্বকের ক্ষতি, দুশ্চিন্তায় নিদ্রাহীনতা আর উদ্বেগের জন্য দীর্ঘমেয়াদী শারীরিক অসুস্থতা যেমন মধুমেহ রোগ, হৃদযন্ত্রের অসুখ সবই হয় দীর্ঘস্থায়ী OCD র জন্য।

চিকিৎসা

OCD একটি চিকিৎসাযোগ্য মানসিক ব্যাধি। সঠিক সময়ে উপযুক্ত চিকিৎসায় অধিকাংশ রোগীর উপসর্গ উল্লেখযোগ্য ভাবে কমে যায়। জীবনের মানও উন্নত হয়।

মনোচিকিৎসাঃ এই চিকিৎসায় চিন্তা ভাবনাকে নিয়ন্ত্রণের রাস্তা দেখান হয়। এর মূল স্তম্ভ হলো কগনিটিভ বিহেভিয়ার থেরাপি (CBT)। এর একটি বিশেষ কৌশল হল এক্সপোজার অ্যান্ড রেসপন্স প্রিভেনশন (ERP)। রোগীকে তার উদ্বেগ উদ্রেককারী চিন্তার সম্মুখীন করা ও বাধ্যতামূলক আচরণের নিয়ন্ত্রণ করতে শেখানো হয়। ভ্রান্ত চিন্তাকে চিহ্নিতকরণ ও সংশোধনের উপায়ও শেখানো হয়।

মাইন্ডফুলনেসঃ এই পদ্ধতিতে রোগীকে তার চিন্তা দ্বারা পরিচালিত না হয়ে চিন্তা গ্রহণ করতে শেখানো হয়।

ঔষধ চিকিৎসাঃ মাঝারি থেকে গুরুতর রোগে ঔষধ প্রয়োজন হয়।

SSRI শ্রেণীর ঔষধ যেমন ফ্লুয়ক্সেটিন, ফ্লুভোক্সামিন, সারট্রালিন। কিছু ক্ষেত্রে ক্লোমিপ্রামিন ব্যবহৃত হয়। ঔষধ দীর্ঘমেয়াদী ও চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে গ্রহণ করা উচিৎ।

সমন্বিত চিকিৎসাঃ মনোচিকিৎসা ও ঔষধ একসাথে গ্রহণ করলে ফল সব সময় ভালো হয়।

পরিপূরক চিকিৎসা (augmentation therapy): গুরুতর ক্ষেত্রে প্রাথমিক ঔষধের সাথে অ্যান্টিসাইকোটিক ঔষধ যোগ করা হয়।

ব্রেইন স্টিমুলেশন পদ্ধতি: ডিপ ব্রেইন স্টিমুলেশন ও ট্রান্সক্রেনিয়াল ম্যাগনেটিক স্টিমুলেশন খুবই সীমিত পরিসরে ব্যবহার করা হয়।

চিকিৎসায় পরিবারের ভূমিকা

OCD চিকিৎসায় পরিবারের ভূমিকা অনস্বীকার্য। এটি শুধু রোগী ও তার চিকিৎসার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। নীরব হলেও পরিবারের ভূমিকা অত্যন্ত গভীর। পরিবারই রোগীর প্রাথমিক আশ্রয়। সহানুভূতিশীল আচরণ, মানবিক দৃষ্টি ও ধৈর্য্যশীলতা রোগীর মানসিক শক্তি বৃদ্ধির সাথে সাথে চিকিৎসায় সাফল্য এনে দেয়।

পরিবারের সদস্যদের উচিৎ ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা ও অতিরিক্ত সমালোচনা না করা। এটিকে মানসিক ব্যাধি হিসেবে গ্রহণ করা উচিৎ। রোগীর মানসিক অশান্তি আর অবাঞ্ছিত আচরণের অংশীদার না হয়ে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিৎ। ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি, সচেতন উপস্থিতি আর ধৈর্য্যশীলতা আরোগ্যের পথে সবচেয়ে বড় সহায়ক।

চিকিৎসার ফলাফল ও পূর্বাভাস

প্রাথমিক পর্যায়ে চিকিৎসা শুরু করলে ফল ভালো হয়।

* দীর্ঘমেয়াদী চিকিৎসার প্রয়োজন
* সম্পূর্ণ সুস্থতা না আসলেও উপসর্গগুলো লক্ষণীয় ভাবে কমে যায়। রোগীর আত্মবিশ্বাসের জায়গাটা অনেকটা ফিরে আসে।

চিকিৎসার প্রতিবন্ধকতা

অবসেশিভ কম্পালশিভ ডিসঅর্ডারের চিকিৎসার পথটি একেবারেই সুগম নয়। নানারকম দৃষ্ট বা অদৃষ্ট প্রতিবন্ধকতা অনুসরণ করতেই থাকে। রোগী অনেক সময় নিজের অসুস্থতাকে মেনে নেওয়ার জন্য মানসিক ভাবে প্রস্তুত থাকে না। তাই চিকিৎসা শুরু হতে বিলম্ব হয়।

লজ্জা, হতাশা আর সামাজিক কলঙ্কের ভয় রোগীর আত্মসংগ্রামকে বাড়িয়ে দিয়ে নীরব করে তোলে।

চিকিৎসা দীর্ঘমেয়াদী হওয়ার ফলে ধৈর্যের অভাব ও অনিয়মিত ঔষধ সেবন, পারিবারিক অজ্ঞতা, আর্থিক সীমাবদ্ধতা, প্রশিক্ষিত মানসিক স্বাস্থ্যকর্মীর

অভাব চিকিৎসার পথে অন্তরায় হয়ে দেখা দেয়। পরিণামে রোগটি জটিল থেকে জটিলতর আকার ধারণ করে।

উপসংহার

অবসেশিভ কম্পালশিভ ডিসঅর্ডার মনোজগতের এক জটিল ব্যাধি যা চিন্তাকে নিয়ন্ত্রণ করে, দৈনন্দিন কাজকর্মকে ব্যাহত করে। এটা কোনো দূরারোগ্য অসুখ নয়। পারিবারিক সহায়তা, সঠিক চিকিৎসা ও সহানুভূতিশীল সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয়ে এই অসুখ নিরাময় সম্ভব। ঘৃণা বা ভয় নয়- সংবেদনশীল মানসিকতা এই অসুখের আরোগ্যের চাবিকাঠি। বিজ্ঞান সম্মত চিকিৎসা আর অসীম ধৈর্য্যের মেলবন্ধনে আক্রান্ত ব্যক্তি আবার মর্যাদাপূর্ণ স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারে।

ডা. শুভেন্দু দত্ত, অ্যাসিস্টান্ট প্রফেসর, মনোরোগ বিভাগ, কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ

শিশু এবং কিশোর-কিশোরীদের মানসিক স্বাস্থ্য ব্যাধি

ডা. সায়ন মাঝি

ভূমিকা

শিশু ও কিশোরদের জন্য মানসিক স্বাস্থ্য ঠিক ততটাই গুরুত্বপূর্ণ, যতটা শারীরিক স্বাস্থ্য। যেমন শিশুদের সর্দি-কাশি বা জ্বর হতে পারে, তেমনি তাদের মানসিক সমস্যাও হতে পারে।

এই নির্দেশিকাটি আপনাকে বুঝতে সাহায্য করবে-

- শিশুদের মানসিক সমস্যাগুলো কীভাবে দেখা যায়
- কেন এগুলো গুরুত্বপূর্ণ
- এবং এগুলোর জন্য কী করা যায়

ভালো খবর হলো, সময়ে চিনে নিয়ে সঠিক সাহায্য পেলে বেশিরভাগ শিশুই খুব ভালোভাবে সুস্থ হয়ে উঠতে পারে। তাই বাবা-মা, শিক্ষক ও অভিভাবকদের জন্য এই বিষয়গুলো জানা খুবই জরুরি।

শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্য বলতে কী বোঝায়?

শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্য বলতে বোঝায়—

শিশুরা কীভাবে ভাবছে, অনুভব করছে ও আচরণ করছে, এবং তারা কীভাবে

- আবেগ সামলায়
- সম্পর্ক বজায় রাখে
- দৈনন্দিন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে

একটি শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য ভালো হলে সে সাধারণত-

- পড়াশোনা ও খেলাধুলা উপভোগ করে
- পরিবার ও বন্ধুদের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক রাখে
- স্বাভাবিক চাপ ও হতাশা সামলাতে পারে
- নিজের অনুভূতি স্বাস্থ্যকরভাবে প্রকাশ করতে পারে
- স্কুল ও অন্যান্য কাজে মোটামুটি ভালো করে

◇কিন্তু যদি কোনো শিশুর ভাবনা, অনুভূতি বা আচরণ এমন হয় যে তা তার

- বাড়ির জীবন
- স্কুল
- বা বন্ধুত্বে সমস্যা তৈরি করে

তাহলে সেটি মানসিক সমস্যার লক্ষণ হতে পারে।

শিশুদের মানসিক সমস্যা কতটা সাধারণ?

শিশুদের মধ্যে মানসিক সমস্যা খুবই সাধারণ-

- সাধারণ সমাজে প্রায় ৬.৫% শিশু ও কিশোরের মানসিক সমস্যা থাকে
- স্কুলে এই হার প্রায় ২৩%
- সাম্প্রতিক বছরগুলোতে, বিশেষ করে কোভিড-১৯ মহামারির পর, এই সংখ্যা বেড়েছে

এর মানে হলো—

◇ মানসিক সমস্যা অস্বাভাবিক বা বিরল নয়

◇ অনেক পরিবারই এর মধ্যে দিয়ে যায়

◇সাহায্য চাওয়া একদম স্বাভাবিক এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ

শিশু ও কিশোরদের সাধারণ মানসিক সমস্যা

১. উদ্বেগজনিত সমস্যা (Anxiety Disorders)—সবচেয়ে লক্ষণীয় সমস্যা

এটা কী?

উদ্বেগজনিত সমস্যায় শিশুরা অস্বাভাবিকভাবে বেশি দুশ্চিন্তা, ভয় বা নার্ভাসনেসে ভোগে-যা সাধারণ দৈনন্দিন দুশ্চিন্তার চেয়ে অনেক বেশি।

কারা বেশি আক্রান্ত হয়?

- শিশুদের মধ্যে সবচেয়ে সাধারণ মানসিক সমস্যা
- যেকোনো বয়সে শুরু হতে পারে
- কিশোরদের মধ্যে বেশি (বিশেষ করে ১৫-১৯ বছর)

লক্ষণ (Warning Signs)

- পড়াশোনা, স্বাস্থ্য, পরিবার বা বন্ধু নিয়ে অতিরিক্ত দুশ্চিন্তা
- শারীরিক সমস্যা: মাথাব্যথা, পেটব্যথা, বমিভাব

- ঘুমের সমস্যা বা দুঃস্বপ্ন
- ভয় লাগে এমন জায়গা বা পরিস্থিতি এড়িয়ে চলা
- মনোযোগ দিতে অসুবিধা
- অস্থিরতা বা খিটখিটে মেজাজ
- দুশ্চিন্তার সময় ঘাম, বুক ধড়ফড় করা

উদাহরণ:

একটি শিশু পরীক্ষার কথা ভেবে সব সময় চিন্তায় থাকে, স্কুলে যাওয়ার আগে পেটব্যথা হয়, বা ভয়ের কারণে স্কুলে যেতে চায় না।

২. অ্যাটেনশন ডেফিসিট হাইপারঅ্যাকটিভিটি ডিসঅর্ডার (ADHD)

এটা কী?

ADHD এমন একটি সমস্যা যেখানে শিশুর মনোযোগ ধরে রাখা ও নিজের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হয়।

কারা বেশি আক্রান্ত হয়?

- প্রায় প্রতি ৯ জনে ১ জন শিশু (১১%)
- মেয়েদের তুলনায় ছেলেদের মধ্যে প্রায় ৩ গুণ বেশি
- সাধারণত স্কুলে যাওয়ার পর ধরা পড়ে
- কিশোর বয়স ও প্রাপ্তবয়স্ক জীবনেও থাকতে পারে

লক্ষণ

মনোযোগের সমস্যা (Inattention)

- কাজে মন বসাতে না পারা
- আশপাশের জিনিসে সহজে মন চলে যাওয়া
- নির্দেশ বা কাজ ভুলে যাওয়া
- পেন, খাতা, হোমওয়ার্ক হারিয়ে ফেলা
- কাজ শুরু করে শেষ না করা
- কথা বললে শুনছে না বলে মনে হওয়া

অতিরিক্ত চঞ্চলতা (Hyperactivity)

- সারাক্ষণ নড়াচড়া করা
- চুপচাপ বসে থাকতে না পারা
- অতিরিক্ত কথা বলা
- অনুপযুক্ত সময়ে দৌড়াদৌড়ি বা ওঠানামা

- নিজের পালার জন্য অপেক্ষা করতে অসুবিধা

হঠাৎ আচরণ (Impulsivity)

- না ভেবে কাজ করা
- অন্যের কথা কেটে কথা বলা
- আবেগ নিয়ন্ত্রণে সমস্যা
- অল্পতেই রেগে যাওয়া

◇ গুরুত্বপূর্ণ: ADHD-এর সঙ্গে অনেক সময় উদ্বেগ বা বিষণ্ণতাও থাকতে পারে। তাই সম্পূর্ণ মূল্যায়ন জরুরি।

উদাহরণ:

৭ বছরের একটি ছেলে ক্লাসে বসে থাকতে পারে না, প্রায়ই হোমওয়ার্ক হারায়, কাজ শুরু করলেও শেষ করতে পারে না।

৩. অটিজম স্পেকট্রাম ডিসঅর্ডার (ASD)

এটা কী?

অটিজম হলো একটি মস্তিষ্কের বিকাশজনিত সমস্যা, যা শিশুর

- যোগাযোগ
- শেখা
- ও অন্যদের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরির ধরনকে প্রভাবিত করে

প্রতিটি অটিজম-আক্রান্ত শিশু আলাদা-কারও সমস্যা কম, কারও বেশি।

কারা বেশি আক্রান্ত হয়?

- সাধারণত ২-৩ বছর বয়সে লক্ষণ বোঝা যায়
- সারাজীবন থাকে
- মেয়েদের তুলনায় ছেলেদের মধ্যে বেশি

লক্ষণ

সামাজিক যোগাযোগে সমস্যা

- চোখে চোখ রেখে কথা না বলা
- ইশারা (হাত নাড়া, দেখানো) বুঝতে বা ব্যবহার করতে অসুবিধা
- কথোপকথনে আদান-প্রদান করতে কষ্ট
- অন্যের অনুভূতি বুঝতে সমস্যা
- একা খেলতে বেশি পছন্দ করা

বারবার একই আচরণ ও আগ্রহ

- খেলনা বা জিনিস নির্দিষ্টভাবে সাজানো
- একই কথা বা শব্দ বারবার বলা
- খেলনার সঙ্গে একইভাবে খেলা
- নির্দিষ্ট জিনিসের প্রতি অতিরিক্ত আসক্তি
- রুটিন বদলালে খুব অস্বস্তি
- হাত নাড়া বা ঘুরতে থাকা
- খুব সীমিত বিষয়ে গভীর আগ্রহ

ইন্দ্রিয় সংবেদনশীলতা

- শব্দ, আলো, স্পর্শে অতিরিক্ত বা কম সংবেদনশীলতা
- কিছু খাবার বা টেক্সচার এড়িয়ে চলা
- জোরে শব্দে কান ঢেকে ফেলা
- ব্যথা বা তাপমাত্রায় অস্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া

◈ গুরুত্বপূর্ণ:
অটিজম বাবা-মায়ের দোষে বা টিকার কারণে হয় না। এটি মস্তিষ্কের বিকাশের ভিন্নতা। অনেক অটিস্টিক শিশুর বিশেষ প্রতিভাও থাকে।
উদাহরণ:
একটি ছোট শিশু নাম ডাকলে সাড়া দেয় না, কল্পনাভিত্তিক খেলা করে না, আর রুটিন বদলালে খুব কাঁদে।

৪. অপোজিশনাল ডিফায়ান্ট ডিসঅর্ডার (ODD)

এটা কী?

ODD হলো এমন একটি সমস্যা যেখানে শিশু রাগী, জেদি ও কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে আচরণ করে, যা তার দৈনন্দিন জীবনে সমস্যা তৈরি করে। এটা সাধারণ দুষ্টুমি বা জেদের চেয়ে বেশি।

কারা বেশি আক্রান্ত হয়?

- স্কুল-বয়সী শিশুদের মধ্যে ১-১৬%
- ছেলেদের মধ্যে বেশি
- সাধারণত ১২ বছরের আগেই শুরু হয়
- প্রায়ই Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD)-এর সঙ্গে দেখা যায়

লক্ষণ

এই শিশুরা প্রায়ই—

- সহজে ও ঘনঘন রেগে যায়
- অল্পতেই বিরক্ত হয়
- বড়দের সঙ্গে নিয়ম নিয়ে তর্ক করে
- নির্দেশ মানতে চায় না
- ইচ্ছা করে অন্যকে বিরক্ত করে
- নিজের ভুলের জন্য অন্যকে দোষ দেওয়া
- প্রতিশোধপরায়ণ বা ইচ্ছাকৃতভাবে কষ্ট দেওয়ার আচরণ
- সহপাঠীদের সঙ্গে ঘনঘন ঝগড়া

কতদিন থাকতে হয়?

ODD নির্ণয়ের জন্য এই লক্ষণগুলো কমপক্ষে ৬ মাস থাকতে হবে এবং একাধিক জায়গায় (যেমন বাড়ি ও স্কুলে) দেখা যেতে হবে।

কেন গুরুত্বপূর্ণ?

চিকিৎসা না হলে ODD থেকে ভবিষ্যতে

- আরও গুরুতর আচরণগত সমস্যা
- সম্পর্কের জটিলতা

হতে পারে।

উদাহরণ:

একটি শিশু সব নিয়ম নিয়ে তর্ক করে, কাজ করতে অস্বীকার করে, ভাইবোনকে দোষ দেয়, আর রেগে গেলে জিনিস ভাঙে।

৫. বিষণ্ণতা / ডিপ্রেশন (Mood Disorders)

এটা কী?

ডিপ্রেশন হলো দীর্ঘদিনের মনখারাপ বা আগ্রহ হারিয়ে ফেলা, যা শিশুর দৈনন্দিন কাজে বাধা দেয়। এটা শুধু "মন খারাপ" নয়-এটা একটি চিকিৎসাযোগ্য রোগ।

কারা আক্রান্ত হয়?

- প্রায় ৪% শিশু বর্তমানে ডিপ্রেশনে ভোগে
- ১২-১৭ বছর বয়সী কিশোরদের মধ্যে প্রায় ১৫% একসময় তীব্র ডিপ্রেশনে ভোগে

- কিশোরদের মধ্যে বেশি, বিশেষ করে কিশোরীরা
- যেকোনো বয়সে শুরু হতে পারে
- বয়ঃসন্ধিতে ঝুঁকি বাড়ে

লক্ষণ

- সপ্তাহ বা মাস ধরে মনখারাপ বা খিটখিটে মেজাজ
- আগে ভালো লাগত এমন কাজে আগ্রহ হারানো
- খাওয়া বা ওজনে পরিবর্তন
- ঘুমের সমস্যা (বেশি বা কম)
- সারাক্ষণ ক্লান্ত লাগা
- মনোযোগ ও সিদ্ধান্ত নিতে অসুবিধা
- নিজেকে মূল্যহীন বা অপরাধী মনে করা
- বন্ধু ও পরিবার থেকে দূরে সরে যাওয়া
- মৃত্যু বা আত্মহত্যার কথা বলা

◈ এটা জরুরি অবস্থা-তৎক্ষণাৎ সাহায্য নিন

◈ গুরুত্বপূর্ণ:

শিশুদের ডিপ্রেশন অনেক সময় দুঃখের বদলে রাগ বা খিটখিটে মেজাজ হিসেবে প্রকাশ পায়।

উদাহরণ:

একটি আগে খেলাধুলাপ্রিয় শিশু খেলাধুলা ছেড়ে দেয়, বন্ধুদের এড়িয়ে চলে, বেশি ঘুমায়, আর বলে-"আমাকে কেউ পছন্দ করে না" "আমি কিছুই ঠিকমতো করতে পারি না।"

৬. শেখার অসুবিধা (Learning Disabilities)

এগুলো কী?

শেখার অসুবিধা হলো মস্তিষ্কের তথ্য প্রক্রিয়াকরণের ভিন্নতা।

এই শিশুদের বুদ্ধিমত্তা সাধারণত স্বাভাবিক বা তার থেকেও বেশি, কিন্তু নির্দিষ্ট কিছু বিষয়ে সমস্যা হয়।

সাধারণ ধরন

ডিসলেক্সিয়া (পড়ার সমস্যা)

- পড়া ও বানানে অসুবিধা

- শব্দ চিনতে কষ্ট
- ধীরে পড়া
- অক্ষর বা শব্দ উল্টো করা

ডিসক্যালকুলিয়া (অঙ্কের সমস্যা)

- সংখ্যা ও অঙ্ক বুঝতে অসুবিধা
- সহজ যোগ-বিয়োগে সমস্যা
- গোনা বা সংখ্যার ধারায় গুলিয়ে ফেলা
- সময় বা টাকা বুঝতে কষ্ট

ডিসগ্রাফিয়া (লেখার সমস্যা)

- লেখায় অসুবিধা
- হাতের লেখা খারাপ
- বানান ভুল
- কাগজে চিন্তা গুছিয়ে লিখতে কষ্ট

কারা আক্রান্ত হয়?

- প্রায় ১০-১৫% মানুষ কোনো না কোনো শেখার অসুবিধায় ভোগে
- পরিবারে থাকতে পারে
- প্রায়ই ADHD বা উদ্বেগের সঙ্গে থাকে

কেন গুরুত্বপূর্ণ?

- পড়াশোনার ফল ও আত্মসম্মান কমে যেতে পারে
- ঠিকমতো সাহায্য না পেলে উদ্বেগ বা ডিপ্রেশন হতে পারে
- আগে চিনে নিলে সঠিক শিক্ষা-পদ্ধতিতে অনেক উপকার হয়

উদাহরণ:

একটি বুদ্ধিমান শিশু অঙ্কে খুব কষ্ট পায়, সংখ্যা গুলিয়ে ফেলে, আর অঙ্ক ক্লাসে খুব দুশ্চিন্তায় থাকে।

৭. মাদক ব্যবহার ও আসক্তি (কিশোরদের মধ্যে) (Addiction)

এটা কী?

কিশোরদের মধ্যে অ্যালকোহল, সিগারেট, ড্রাগ বা অন্য নেশাদ্রব্য এমনভাবে ব্যবহার করা; যা শারীরিক ও মানসিক ক্ষতি করে।

কারা বেশি ঝুঁকিতে?

- যাদের মানসিক সমস্যা আছে কিন্তু চিকিৎসা হয়নি
- যাদের পরিবারে নেশার ইতিহাস আছে
- যারা ট্রমা বা অতিরিক্ত স্ট্রেসে আছে
- যাদের বন্ধুরা নেশা করে

সতর্ক লক্ষণ

- হঠাৎ বন্ধুবান্ধব বদলে যাওয়া
- পরিবার ও আগের আগ্রহ থেকে দূরে সরে যাওয়া
- পড়াশোনার ফল খারাপ হওয়া বা স্কুল ফাঁকি
- আচরণ বা মেজাজে বড় পরিবর্তন
- অতিরিক্ত গোপনীয়তা, মিথ্যা বলা
- শারীরিক লক্ষণ: লাল চোখ, ওজন কমা, অপরিচ্ছন্নতা
- নিঃশ্বাস বা পোশাকে নেশার গন্ধ
- ঘরে সন্দেহজনক জিনিস পাওয়া
- টাকা চুরি বা অস্বাভাবিকভাবে টাকা চাওয়া
- বন্ধুদের সঙ্গে "কোড ভাষা" ব্যবহার

কেন গুরুত্বপূর্ণ?

কিশোর বয়সে নেশা

- বেড়ে ওঠা মস্তিষ্কের ক্ষতি করে
- ভবিষ্যতে আসক্তির ঝুঁকি বাড়ায়
- অন্য মানসিক সমস্যাকে আরও জটিল করে তোলে

কেন দ্রুত শনাক্তকরণ ও চিকিৎসা এত জরুরি?

গুরুত্বপূর্ণ সময়কাল

সারা জীবনের মানসিক সমস্যার প্রায় ৫০% শুরু হয় ১৪ বছরের আগেই। তাই শিশু ও কিশোর বয়স হলো সাহায্য করার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়।

আগেভাগে সাহায্য পেলে কী লাভ?

1. সমস্যা বাড়তে বাধা দেয় ছোট সমস্যা বড় হওয়ার আগেই থামে
2. চিকিৎসা বেশি কার্যকর হয় কম সময়ে ভালো ফল পাওয়া যায়
3. দীর্ঘমেয়াদি অক্ষমতা কমে পড়াশোনা ও সম্পর্ক রক্ষা হয়

বাবা-মা ও পরিবারের ভূমিকা

কীভাবে শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্যে সহায়তা করবেন

১. পাশে থাকুন ও মন দিয়ে শুনুন

- প্রতিদিন সন্তানের সঙ্গে কিছু গুণগত সময় কাটান
- তারা অনুভূতির কথা বললে বিচার না করে শুনুন
- মোবাইল, টিভির মতো মনোযোগ নষ্টকারী জিনিস সরিয়ে রাখুন
- কাঁদতে বা রাগ প্রকাশ করতে দিন-এটা স্বাভাবিক

২. নিরাপদ ও স্থিতিশীল ঘরোয়া পরিবেশ তৈরি করুন

- নিয়ম ও রুটিন একরকম রাখুন
- নিয়মিত ভালোবাসা ও যত্ন প্রকাশ করুন
- বাড়ির ঝগড়া ও চাপ যতটা সম্ভব কমান
- শিশুর কাছে নিজেকে নির্ভরযোগ্য করে তুলুন

৩. মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে কথা বলুন

- সহজ ও সৎ ভাষা ব্যবহার করুন
- বোঝান যে সবারই কখনো কখনো খারাপ দিন যায়
- বলুন-মানসিক সমস্যা দুর্বলতা নয়, এটি একটি চিকিৎসাযোগ্য সমস্যা
- লজ্জা ও ভয় দূর করার চেষ্টা করুন

৪. স্বাস্থ্যকরভাবে আবেগ সামলাতে শেখান

- রাগ বা দুশ্চিন্তায় গভীর শ্বাস নেওয়া শেখান
- অনুভূতির নাম দিতে সাহায্য করুন (রাগ, দুঃখ, ভয়)
- শরীরচর্চা ও খেলাধুলায় উৎসাহ দিন

তাদের পছন্দের কাজ ও শখে সমর্থন করুন

৫. লক্ষণের দিকে সতর্ক নজর রাখুন

- আপনার সন্তানের স্বাভাবিক আচরণ কী-তা জানুন
- আচরণ, মেজাজ বা সম্পর্কে হঠাৎ পরিবর্তন খেয়াল করুন
- উদ্বেগজনক লক্ষণ অবহেলা করবেন না
- একজন অভিভাবক হিসেবে নিজের অনুভূতিকে গুরুত্ব দিন

৬. নিজে ভালো উদাহরণ তৈরি করুন

- নিজের মানসিক স্বাস্থ্যের যত্ন নিন

- চাপ সামলানোর স্বাস্থ্যকর উপায় দেখান
- ভুল হলে স্বীকার করুন ও সমস্যা সমাধান দেখান
- সুস্থ সম্পর্ক কীভাবে গড়ে ওঠে তা দেখান

৭. শক্তিশালী সম্পর্ক গড়ে তুলতে সাহায্য করুন

- বন্ধুত্বে সমর্থন দিন
- পরিবার একসঙ্গে খাওয়া ও কাজ করুন
- আত্মীয়দের সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রাখুন
- সমাজের কাজে যুক্ত করুন (খেলা, ক্লাব, স্কাউট ইত্যাদি)

৮. প্রত্যাশার ভারসাম্য রাখুন

- সাহায্য করুন, কিন্তু অতিরিক্ত চাপ দেবেন না
- ফলের চেয়ে চেষ্টাকে বেশি গুরুত্ব দিন
- বয়স ও ক্ষমতা অনুযায়ী প্রত্যাশা রাখুন
- অতিরিক্ত পারফেকশনিজম এড়িয়ে চলুন

৯. প্রয়োজন হলে পেশাদার সাহায্য নিন

- “নিজে থেকেই ঠিক হয়ে যাবে"-এই ভেবে দেরি করবেন না
- সাহায্য চাওয়া দুর্বলতা নয়, এটা দায়িত্বশীলতা
- চিকিৎসার প্রক্রিয়ায় সক্রিয়ভাবে অংশ নিন
- দেওয়া পরামর্শগুলো মেনে চলুন

১০. নিজের যত্ন নিন

- মানসিক সমস্যায় ভোগা শিশুকে বড় করা কঠিন
- নিজের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের যত্ন নিন
- সাপোর্ট গ্রুপে যোগ দিন
- প্রয়োজনে সাহায্য চাইতে দ্বিধা করবেন না

প্রচলিত ভুল ধারণা ও বাস্তব সত্য

ভুল ধারণা:
শিশুদের মানসিক সমস্যা আসলে রোগ নয়

সত্য:
এগুলো বাস্তব চিকিৎসাযোগ্য সমস্যা-যার পেছনে জৈবিক, মানসিক ও সামাজিক কারণ থাকে

ভুল ধারণা:
শিশুদের মানসিক সমস্যা খুব বিরল
সত্য:
প্রতি বছর প্রায় ৫ জনে ১ জন শিশুর কোনো না কোনো মানসিক সমস্যা হয়

ভুল ধারণা:
বাবা-মায়ের দোষেই শিশুর মানসিক সমস্যা হয়
সত্য:
এগুলো জিন, মস্তিষ্কের রাসায়নিক পরিবর্তন, পরিবেশ ও অভিজ্ঞতার ফল- শুধু অভিভাবকের দোষ নয়

ভুল ধারণা:
মানসিক সমস্যা মানেই দূর্বলতা
সত্য:
এটা দুর্বলতা নয়। সমস্যা স্বীকার করে সাহায্য নেওয়াই সাহসের কাজ

ভুল ধারণা:
এই শিশুরা "খারাপ" বা "ভাঙা"
সত্য:
তারা অসুস্থ নয়, তারা একটি স্বাস্থ্যগত সমস্যার সঙ্গে লড়ছে-তাদের দরকার সমর্থন

ভুল ধারণা:
সব ক্ষেত্রেই ওষুধ দরকার
সত্য:
কিছু ক্ষেত্রে ওষুধ দরকার হয়, সব ক্ষেত্রে নয়। চিকিৎসা শিশুভেদে আলাদা হওয়া উচিত

ভুল ধারণা:
অবহেলা করলে নিজে থেকেই ঠিক হয়ে যাবে
সত্য:
চিকিৎসা না করলে সমস্যা সাধারণত আরও বাড়ে। আগেভাগে সাহায্যই সবচেয়ে ভালো

ভুল ধারণা:

ADHD মানেই চঞ্চল ছেলে শিশু

সত্য:

মেয়েদেরও ADHD হয়, এবং অনেক ক্ষেত্রে চঞ্চলতা না থাকলেও মনোযোগের সমস্যা থাকে

ভুল ধারণা:

অটিজম মানেই কম বুদ্ধি

সত্য:

অনেক অটিস্টিক শিশু খুবই মেধাবী। এটি শেখার ও যোগাযোগের ভিন্ন ধরন

ভুল ধারণা:

মানসিক চিকিৎসা মানে "পাগল"

সত্য:

চিকিৎসা নেওয়া মানে আপনি সন্তানের ভালোবাসা ও সুস্থতাকে গুরুত্ব দিচ্ছেন

ডা. সায়ন মাঝি, সিনিয়র রেসিডেন্ট, মনোরোগ বিভাগ, কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ

নেশা

ডা. গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়

‘নেশা’ কথাটার উৎস আরবি শব্দ ‘নশাতুন’।

আর ‘অ্যাডিকশন’ শব্দটার গোড়ায় লাতিন ‘অ্যাডিকসিও’। সাদামাটা অর্থে যা আকর্ষণ করে, তাইই নেশা। তবে প্রথম দিকে যা আকর্ষণের, পরবর্তী সময়ে সেটাই আছড়ে ফেলে। প্রথমে যা ভালবেসে, কিম্বা দুঃখ শোক ভুলতে গ্রহণ করে মানুষ, সময় এলে সেই নেশার বস্তুই গ্রাস করে তাকে।

আদ্যিকালের মানুষ নিশ্চিত লক্ষ্য করেছিল যে কোনো কোনো গাছের ফল, কি বীজ, শেকড় বাকর, গাছের আঠা, এসবের একটা অদ্ভুত গুন আছে। কিছু সময়ের জন্য হলেও সেগুলো আচ্ছন্ন করে মানুষকে।

তাই কৃষিকাজ শেখার আগেই নেশা করতে শুরু করেছে মানুষ।

“অ্যাডিকশন'' কথাটা বহু ব্যবহারে জীর্ণ হতে হতে ‘‘মানি অ্যাডিকশন'', ‘‘বুক অ্যাডিকশন'' এসবেও ছড়িয়ে পড়ায় চিকিৎসকের ভাষায় এটা ‘‘সাবস্টেন্স ইউজ''! অর্থাৎ, আবিষ্ট করে, মনকে আনন্দ এনে দেয় এমন কোনো বস্তু বারবার নেওয়া। নিতে নিতে এমন হয় যে সেই বস্তুটা না নিলেই শরীর আর মন অস্থির হয়ে পড়ে। তবে নেশা করতে গেলে যে সাবস্টেন্স লাগবেই তাও তো নয়। আজকাল তো ইন্টারনেট থেকে কেনাকাটা, এমন হাজার অভ্যাসেরও দাসত্ব করছি আমরা, তাও কি নেশা নয়?

কোনো বস্তু অথবা বিষয়ে আগ্রহ আসক্তিতে পরিণত হয়েছে কিনা বুঝতে গেলে কয়েকটা শর্ত জেনে নেওয়া আবশ্যক।

মনোবিজ্ঞানের ভাষায় এই শর্ত গুলোর প্রথমেই আছে—

১) স্যালিয়েন্স: সর্বক্ষণের যাবতীয় মনোযোগ যখন ঐ নেশার বস্তু অথবা বিষয়ে এসে দাঁড়ায়। সন্ধেয় কখন গিয়ে মদের ঠেকে বসব, কাকে কাকে বলব, কি হবে, কোথায় হবে, এইসব চিন্তা।

২) মুড মডিফিকেশন: ঐ নির্দিষ্ট বস্তু বা বিষয়টা পেলে মুডটাই বদলে যায়। সে সিগারেট, মদ, গাঁজা, কিম্বা অফলাইন কি অনলাইন গেমস, যাইই হোক।

৩) টলারেন্স: পেতে পেতে চাহিদা বাড়ে। যে পরিমাণ নেশার বস্তু যতটা আনন্দ আগে দিত, তা আর না হওয়ায় দিনের পর দিন পরিমাণ বাড়তেই

থাকে। গেমিং কি গ্যাম্বলিঙ-এর বেলাতেও একই ভাবে বিভিন্ন অ্যাপ আর গ্যাজেটের চাহিদা, ক্রমবর্ধমান সময় জুড়ে মোবাইল ঘাঁটাঘাঁটি, এ সবই টলারেন্সের চিহ্ন।

৪) **উইথড্রল:** না পেলেই সমস্যা। যতক্ষণ না পাওয়া যায়, অস্থিরতা। শারীরিক প্রক্ষোভ।

৫) যাবতীয় সমস্যার মূল উৎসই যেখানে নেশা। সে আর্থিক, সামাজিক, মানসিক, শারীরিক, কর্মক্ষেত্র, সংসারের অশান্তি, যাইই হোক।

৬) যত প্রতিজ্ঞা, যত প্রতিশ্রুতি, দু-চারদিন ছেড়ে দেওয়া, যাইই হোক, ঘুরে ফিরে আসে সেই আসক্তি!

একটু খেয়াল করলেই দেখবেন, প্রচলিত নেশার বেশিরভাগের উৎস উদ্ভিদ থেকে। মদ, গাঁজা, আফিম, সিগারেট, বিড়ি সবই তাই। তবে সিন্থেটিক বা সেমি সিন্থেটিক বস্তুও আছে। চিন দেশে কিম্বা আমাদের দেশে একসময় আফিমের চল ছিল খুব। এও পপি গাছের উপক্ষার। তারপর সেটা পরিবর্তিত হতে হতে মরফিন, হেরোইন, কোডেইন, জাতীয় ওপিঅয়েড চলে এলো।

আবার সম্পূর্ণ ভাবে রসায়নাগারে তৈরি নেশার বস্তুও আছে। এল এস ডি, কিম্বা বেনজোডায়াজেপিন জাতীয় নিদ্রাকর্ষি ওষুধের উদাহরণ।

নেশা করা যে খারাপ, নেশা করলে যে শরীরের নানান ক্ষতি হয়, এ তো সবাই জানে, তবুও নেশা করে কেন মানুষ?

কারণ হিসেবে মানসিক আকর্ষণ, পরিবেশের সহায়ক ভূমিকা এবং জৈবিক বা বায়োলজিক্যাল, এই তিনটে যুক্তি বোঝাটা জরুরি মনে হয়।

আনন্দ এবং দুঃখ, এই দুটো দিনেই নেশা করে মানুষ। প্রথমটা উদযাপন, দ্বিতীয়টা দুঃখ শোক ভোলার চেষ্টা। প্রথমটা অন্যদের দেখে, মদ না খেলে আনন্দটা ঠিক উদযাপিত হলো না বলেই মনে হওয়ায়। যদিও উৎসবে বিনোদনের নেশা করতে করতেও প্রতি দশজনের মধ্যে অন্তত দুই থেকে তিন জন আসক্ত হয়ে পড়েন।

আবার শোক ভুলতে মদ বা নেশার পরিণতিও সুবিধের নয়। মদ জাতীয় পদার্থের প্রভাবে অবসাদের হার বাড়ে, আত্মহত্যার প্রবণতাও যে বাড়ে, সেটা প্রমাণিত।

জৈবিক কারণটাই বা কি?

আমাদের মস্তিষ্কে বিবর্তনের সূত্রেই এমন বহু নিউরো রিসেপ্টর রয়েছে বাইরে থেকে আসা নেশার বস্তু সেখানে জুড়ে যায়।

মস্তিষ্কের অনেক নিউরোট্রান্সমিটারের মধ্যে ডোপামিন নামের স্নায়ু রাসায়নিকটাকে ''পুরস্কার'' বা রিওয়ার্ড হিসেবে ধরা হয়। ভালো গান শুনলে, ভালো খাবার খেলে, ভালো খেলা দেখলে, সক্রিয় ভাবে ভালো কিছু করলে মস্তিষ্কের রিওয়ার্ড সার্কিটে এই ডোপামিন বেড়ে যাওয়ায় একটা দারুণ আনন্দের অনুভূতি হয়। কিন্তু এ তো আর ইচ্ছে মতো ঘটানো যায় না। বাইরে থেকে আসা নেশার বস্তু চটজলদি এই ডোপামিনের ক্ষরণ বাড়াতে পারে। দু চারদিন পর এই শর্টকার্ট রাস্তাটাই প্রধান হয়ে ওঠে। শরীর তাতেই অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। দু-দন্ড নেশার জিনিসটা না পেলেই তখন উইথড্রল সিনড্রোম!

যত বড়ো নেশা, তত দ্রুত অভ্যাস, আর তত মারাত্মক উইথড্রল। সেই কষ্ট কমাতে গিয়ে আবার নেশা। তখন আর ভালো লাগা নয়, যন্ত্রণা এড়াতেই নেশার জোগাড় অক্ষুণ্ণ রাখতে হয়।

কতো রকম নেশা আছে?

সে সংখ্যা গুনে শেষ করা যাবে না। আমাদের দেশে প্রচলিত নেশার কিছু শর্ত সাপেক্ষে অনুমোদিত অর্থাৎ লিসিট বা লাইসেন্সড। মদ, সিগারেট, বিড়ি, গুটখা, পানমশলা, চা, কফি, এর উদাহরণ। এদের দাম বাড়িয়ে, ভয় দেখানো ছবি টবি লাগিয়েও এসবের নেশা কমানো যায়নি। নিন্দুকে বলবেন, বিশেষ কারণে এখানে সদিচ্ছার অভাব আছে।

এদেশে যত গৃহ অশান্তি কিম্বা দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়, তার অনেকটাই মদের কারণে।

তামাকের নেশাও তাই। মুখগহ্বরের ক্যান্সার থেকে শুরু করে থেকে সি ও পি ডি, হার্টের রোগ পর্যন্ত কতো যে ভয়ঙ্কর রোগের মূল ঘটক এনারা, সে খবর কেই বা রাখেন।

গাঁজা বা হেরোইন জাতীয় ইলিসিট অর্থাৎ অননুমোদিত নেশার জোগানেরও কিন্তু বিরাম নেই। ক্ষতিরও শেষ নেই।

দীর্ঘদিন গাঁজায় দম দেওয়ার অভ্যাস জগতের সবকিছু থেকেই দূরে পাঠিয়ে দেয়। ডাক্তারেরা বলেন, ক্রনিক আমোটিভেশনাল সিনড্রোম। কারও কারও একিউট সাইকোসিস হয়, একেবারেই সিজোফ্রেনিয়ার মতো ক্লিনিকাল ছবি। নিন্দুকে বলেন, গাঁজা না থাকলে এদেশে অন্তত ৩০ শতাংশ সিজোফ্রেনিয়া হতোই না হয়তো।

এর সাথেই রয়েছে ঘুমের ওষুধের নেশা, কাফ সিরাপের নেশা কিম্বা ডেনড্রাইট জাতীয় আঠালো পদার্থ, নেল পালিশ রিমুভার, এসবের নেশাও।

কোকেন, এল এস ডি, অথবা পার্টি ড্রাগস্ এর কথা আর বলছি না। আপাতদৃষ্টিতে বড়লোকের নেশা মনে হলেও পরোক্ষভাবে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন।

তবে সবাইকে ছাপিয়ে এযুগের প্রধান নেশা হয়ে উঠছে এখন ইন্টারনেট, মোবাইল ফোন, গেমিং, গ্যাম্বলিঙ এর নেশা। জিম অ্যাডিকশন থেকে পর্নোগ্রাফি, ফুড অ্যাডিকশন থেকে কেনাকাটার নেশা। সবমিলিয়ে যাদের ''বিহেভিয়ারাল অ্যাডিকশন'' বলা হয়।

এই আলোচনার শেষ নেই তাই। বরং জেনে রাখা ভালো নিজের বা বাড়ির কারো এমনটা হলে কি করবেন, কোথায় যাবেন।

মোদ্দা কথাটা হলো, নেশা কেউ সারিয়ে দিতে পারেনা, তবে সহায়তা অবশ্যই করা সম্ভব। এর একটা প্রস্তুতি লাগে, কেন নেশা ছাড়বো?

শারীরিক বিপর্যয়, সাংসারিক গোলযোগ, কর্মক্ষেত্রে সমস্যা, সবই হতে পারে কারণ।

এবার প্রশ্ন, কোথায় যাবেন? কিভাবে মুক্তি পাবেন এর থেকে?

উইথড্রল সিনড্রোম যেসব নেশায় বেশি হয়, সচরাচর সে ক্ষেত্রগুলোতে ভর্তি রেখেই চিকিৎসা হয়। তবে সেটা চিকিৎসকই নির্ধারণ করবেন। চিকিৎসা পদ্ধতিতেও একই কথা।

রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি, অন্যান্য শারীরিক বিষয়ের চিকিৎসা, হার্ম রিডাকশন পদ্ধতি, প্রয়োজন অনুযায়ী চিকিৎসকই ঠিক করবেন। কাউন্সেলিং এবং সাইকোথেরাপির ভূমিকা এখানে যথেষ্ঠই।

প্রাথমিক ''ডিটক্সিফিকেশন''-এর পরের দীর্ঘ সময় কিন্তু লেগে থাকতে হবে, নচেৎ পুনরাবৃত্তি রিল্যাপ্স অবধারিত। বাড়ির লোকের সহায়তাও জরুরি। তাঁদের সঙ্গে নিয়েই কাজটা করতে হয়।

নেশার চিকিৎসার সমস্যা হলো, বারবার রিল্যাপ্স, নানান জটিলতা এবং চিকিৎসা বিষয়ে সামগ্রিক একটা হতাশা, যাকে ''থেরাপিউটিক নিহিলিজম'' বলা যায়।

পর্যাপ্ত ধৈর্য, আস্থা, সমবেদনা, মোটিভেশনাল দিকটা ধরে রাখতে পারা, এই সব মেলাতে পারলে তবেই সুফল ফলবে।

অধ্যাপক ডা. গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভাগীয় প্রধান, সাইকিয়াট্রি, কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ

ডিমেনশিয়াঃ শুধু স্মৃতি হারানোর গল্প নয়

ডা. ইন্দ্রনীল সাহা

একদিন সকালে অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক অরুণবাবু প্রতিদিনের মতো হাঁটতে বেরিয়েছিলেন। বহু বছরের চেনা পথ। কিন্তু সেদিন হঠাৎ তিনি থেমে গেলেন একটি মোড়ে। কিছুতেই মনে করতে পারছিলেন না, বাড়ি কোন দিকে। কয়েক মিনিট পর এক প্রতিবেশী তাঁকে চিনে বাড়ি পৌঁছে দিলেন।

বাড়িতে ফিরে সবাই বললেন, "বয়স হয়েছে, তাই ভুলে যাচ্ছেন। এ আর এমন কী!"

কিন্তু সত্যিই কি সব ভুলে যাওয়াই বয়সের স্বাভাবিক লক্ষণ?

আমরা সবাই কখনও না কখনও কারও নাম ভুলে যাই, চশমা কোথায় রেখেছি মনে করতে পারি না, কিংবা কোনো কাজের কথা হঠাৎ ভুলে যাই। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কিছুক্ষণ পরে আবার মনে পড়ে যায়। কিন্তু যখন এই ভুলে যাওয়া ধীরে ধীরে একজন মানুষের চিন্তা, বিচারবুদ্ধি, ভাষা, সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা এবং দৈনন্দিন জীবনকে প্রভাবিত করতে শুরু করে, তখন সেটি আর শুধু বার্ধক্যের পরিবর্তন নয়। এটি হতে পারে ডিমেনশিয়া।

ডিমেনশিয়া মানেই শুধু স্মৃতি হারিয়ে ফেলা নয়। এটি এমন একটি অবস্থা, যেখানে মস্তিষ্কের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজ ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়ে। অনেক সময় রোগী নিজে বুঝতেই পারেন না যে তাঁর মধ্যে পরিবর্তন হচ্ছে; বরং পরিবারের মানুষই প্রথম লক্ষ্য করেন—একই প্রশ্ন বারবার করা, পরিচিত রাস্তায় পথ হারিয়ে ফেলা, হিসাব-নিকাশে ভুল করা কিংবা আচরণে অস্বাভাবিক পরিবর্তন।

বর্তমানে পৃথিবীজুড়ে মানুষের গড় আয়ু বাড়ছে। এর সঙ্গে বাড়ছে ডিমেনশিয়ায় আক্রান্ত মানুষের সংখ্যাও। তাই এটি শুধু একজন ব্যক্তির নয়, একটি পরিবার, সমাজ এবং জনস্বাস্থ্যের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। অথচ এখনও অনেকেই মনে করেন, "এ তো বার্ধক্যেরই অংশ, চিকিৎসা করে কী হবে?" এই ভুল ধারণার কারণেই বহু রোগীর রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা শুরু হতে দেরি হয়।

আসলে, সময়মতো রোগ শনাক্ত করা, সঠিক চিকিৎসা, নিয়মিত মানসিক ও সামাজিক সহায়তা এবং পরিবারের আন্তরিক যত্নের মাধ্যমে একজন

ডিমেনশিয়া রোগী দীর্ঘদিন সম্মান, নিরাপত্তা ও স্বাভাবিক জীবনযাপনের সুযোগ পেতে পারেন। চিকিৎসার উদ্দেশ্য শুধু রোগের গতি কমানো নয়, রোগী এবং তাঁর পরিবারের জীবনকে আরও অর্থবহ ও মানবিক করে তোলা।

এই অধ্যায়ে আমরা সহজ ভাষায় জানব—ডিমেনশিয়া কী, কেন হয়, কীভাবে এর লক্ষণ চিনবেন, কখন চিকিৎসকের কাছে যাবেন, বর্তমানে কী কী চিকিৎসা রয়েছে, একজন কেয়ারগিভারের ভূমিকা কী এবং কীভাবে আমরা সবাই মিলে একজন ডিমেনশিয়া আক্রান্ত মানুষের পাশে দাঁড়াতে পারি।

কারণ, ডিমেনশিয়ায় স্মৃতি হয়তো ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে যায়, কিন্তু ভালোবাসা, সম্মান এবং মানবিকতার ভাষা কখনও হারিয়ে যায় না।

২. ডিমেনশিয়া কি? স্বাভাবিক বার্ধক্য নাকি রোগ?

ডিমেনশিয়া কোনো একক রোগ নয়; এটি একগুচ্ছ লক্ষণের সমষ্টি (Syndrome)। বিভিন্ন মস্তিষ্কজনিত রোগের কারণে যখন একজন মানুষের স্মৃতিশক্তি, ভাষা, চিন্তাভাবনা, বিচারবুদ্ধি, পরিকল্পনা করার ক্ষমতা এবং দৈনন্দিন কাজ করার দক্ষতা ধীরে ধীরে কমে যায় এবং তার স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়, তখন তাকে ডিমেনশিয়া বলা হয়। এর মধ্যে আলঝাইমার রোগ সবচেয়ে বেশি দেখা যায়, তবে ভাসকুলার ডিমেনশিয়া, লিউই বডি ডিমেনশিয়া এবং ফ্রন্টোটেম্পোরাল ডিমেনশিয়াও গুরুত্বপূর্ণ।

অনেকেই মনে করেন, বয়স বাড়লে ভুলে যাওয়া স্বাভাবিক, তাই ডিমেনশিয়াও বার্ধক্যেরই অংশ। এই ধারণা সঠিক নয়। স্বাভাবিক বার্ধক্যে মানুষ মাঝে মাঝে কোনো নাম বা জিনিসের কথা ভুলে যেতে পারেন, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে তা মনে পড়ে যায় এবং দৈনন্দিন কাজ করতে সাধারণত অসুবিধা হয় না।

অন্যদিকে, ডিমেনশিয়ায় রোগী বারবার একই প্রশ্ন করেন, সদ্য ঘটে যাওয়া ঘটনা ভুলে যান, পরিচিত রাস্তায় পথ হারিয়ে ফেলেন, টাকা-পয়সার হিসাব রাখতে বা ওষুধ খেতে ভুল করেন। অনেক সময় তিনি নিজের সমস্যাটিও বুঝতে পারেন না। ধীরে ধীরে অন্যের সাহায্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন।

সহজ করে বলা যায়, স্বাভাবিক বার্ধক্যে স্মৃতি কিছুটা দুর্বল হতে পারে, কিন্তু ডিমেনশিয়ায় সেই পরিবর্তন একজন মানুষের স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার ক্ষমতাকেই প্রভাবিত করে।

মনে রাখবেন—বয়স বাড়া স্বাভাবিক, কিন্তু ডিমেনশিয়া বার্ধক্যের স্বাভাবিক পরিণতি নয়। সময়মতো রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসার মাধ্যমে অনেক ক্ষেত্রেই রোগের অগ্রগতি ধীর করা যায় এবং রোগীকে দীর্ঘদিন স্বাভাবিক ও মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপনে সাহায্য করা সম্ভব।

৩. ডিমেনশিয়ার লক্ষণ ও মাইল্ড কগনিটিভ ইমপেয়ারমেন্ট (MCI)

ডিমেনশিয়ার লক্ষণ সাধারণত ধীরে ধীরে শুরু হয় এবং সময়ের সঙ্গে বাড়তে থাকে। শুরুতে রোগী বা পরিবারের সদস্যরা অনেক সময় এটিকে সাধারণ ভুলে যাওয়া বলে মনে করেন। কিন্তু যখন এই পরিবর্তন দৈনন্দিন জীবনকে প্রভাবিত করতে শুরু করে, তখন সতর্ক হওয়া জরুরি।

ডিমেনশিয়ার প্রধান লক্ষণগুলোর মধ্যে রয়েছে—বারবার একই প্রশ্ন করা, সদ্য ঘটে যাওয়া ঘটনা ভুলে যাওয়া, পরিচিত মানুষ বা স্থান চিনতে অসুবিধা হওয়া, সঠিক শব্দ খুঁজে না পাওয়া, টাকা-পয়সার হিসাব বা দৈনন্দিন কাজ করতে সমস্যা হওয়া, সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা কমে যাওয়া এবং আচরণ বা ব্যক্তিত্বে পরিবর্তন। অনেক রোগীর ক্ষেত্রে অকারণ সন্দেহ, রাগ, উদ্বেগ, বিষণ্ণতা, অস্থিরতা বা ঘুমের সমস্যাও দেখা দিতে পারে। তাই ডিমেনশিয়া শুধু স্মৃতির রোগ নয়; এটি মস্তিষ্কের বিভিন্ন উচ্চতর কার্যক্ষমতার (Higher Cognitive Functions) অবনতি।

ডিমেনশিয়ার আগে অনেকের ক্ষেত্রে একটি মধ্যবর্তী অবস্থা দেখা যায়, যাকে মাইল্ড কগনিটিভ ইমপেয়ারমেন্ট (**Mild Cognitive Impairment** বা **MCI**) বলা হয়। এ অবস্থায় স্মৃতি বা চিন্তাশক্তিতে কিছুটা দুর্বলতা দেখা দিলেও ব্যক্তি এখনও নিজের দৈনন্দিন কাজ স্বাধীনভাবে করতে পারেন। **MCI** মানেই ডিমেনশিয়া নয়। অনেকের ক্ষেত্রে এটি বছরের পর বছর একই রকম থাকে, কারও ক্ষেত্রে আবার চিকিৎসাযোগ্য কারণ দূর করলে উন্নতিও হতে পারে। তবে কিছু রোগীর ক্ষেত্রে এটি ধীরে ধীরে ডিমেনশিয়ায় পরিণত হতে পারে।

তাই বারবার ভুলে যাওয়া, আচরণের পরিবর্তন বা স্মৃতিশক্তির অবনতি দেখা দিলে 'বয়সের দোষ' বলে অবহেলা না করে দ্রুত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের

পরামর্শ নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। সময়মতো রোগ শনাক্ত হওয়াই সফল চিকিৎসার প্রথম ধাপ।

৪. ডিমেনশিয়ার বিভিন্ন ধরন

সব ডিমেনশিয়ার কারণ বা লক্ষণ একরকম নয়। কোন অংশের মস্তিষ্ক বেশি আক্রান্ত হচ্ছে, তার উপর নির্ভর করে রোগের ধরন ও উপসর্গ ভিন্ন হতে পারে।

সবচেয়ে বেশি দেখা যায় আলঝাইমার রোগ (**Alzheimer's disease**), যা মোট ডিমেনশিয়ার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ ক্ষেত্রে দায়ী। এ রোগে সাধারণত স্মৃতিশক্তি ধীরে ধীরে কমতে থাকে এবং পরে ভাষা, বিচারবুদ্ধি ও দৈনন্দিন কাজ করার ক্ষমতাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

ভাসকুলার ডিমেনশিয়া (**Vascular Dementia**) মস্তিষ্কে রক্ত সরবরাহ কমে যাওয়া বা স্ট্রোকের কারণে হয়। এতে স্মৃতির পাশাপাশি পরিকল্পনা, মনোযোগ ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস ও হৃদরোগ এ ধরনের ডিমেনশিয়ার ঝুঁকি বাড়ায়।

লিউই বডি ডিমেনশিয়া (**Lewy Body Dementia**)-তে রোগীর দৃষ্টিভ্রম (Visual Hallucination), মনোযোগের ওঠানামা এবং পারকিনসন রোগের মতো চলাফেরার সমস্যা দেখা দিতে পারে।

অন্যদিকে, ফ্রন্টোটেম্পোরাল ডিমেনশিয়া (**Frontotemporal Dementia**) তুলনামূলকভাবে কম বয়সে শুরু হতে পারে। এ রোগে প্রথম থেকেই স্মৃতির পরিবর্তে আচরণ, ব্যক্তিত্ব বা ভাষার সমস্যা বেশি দেখা যায়। অনেক সময় রোগী অশোভন আচরণ করেন, একই কাজ বারবার করেন বা সামাজিক নিয়ম মানতে অসুবিধা হয়।

অনেকের ক্ষেত্রে একাধিক ধরনের পরিবর্তন একসঙ্গে থাকতে পারে, যাকে মিশ্র ডিমেনশিয়া (**Mixed Dementia**) বলা হয়।

মনে রাখা জরুরি, সব ভুলে যাওয়াই ডিমেনশিয়া নয়। ভিটামিন বি$_{12}$-এর অভাব, থাইরয়েডের সমস্যা, বিষণ্ণতা, কিছু ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া বা অন্যান্য শারীরিক অসুস্থতার কারণেও ডিমেনশিয়ার মতো লক্ষণ দেখা দিতে পারে। তাই সঠিক কারণ নির্ণয় করে চিকিৎসা শুরু করাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

৫. রোগ নির্ণয়, প্রতিরোধ ও প্রাথমিক হস্তক্ষেপ (Early Intervention)

ডিমেনশিয়া নির্ণয়ের জন্য কোনো একটি মাত্র পরীক্ষা যথেষ্ট নয়। রোগীর বিস্তারিত ইতিহাস, পরিবারের সদস্যদের পর্যবেক্ষণ, শারীরিক ও মানসিক পরীক্ষা এবং স্মৃতিশক্তি মূল্যায়নের (যেমন MMSE, MoCA) পাশাপাশি প্রয়োজন অনুযায়ী রক্ত পরীক্ষা ও মস্তিষ্কের **MRI** বা **CT Scan** করা হয়। এসব পরীক্ষার মাধ্যমে ডিমেনশিয়ার ধরন নির্ণয় এবং ভিটামিন বি$_{12}$-এর অভাব, থাইরয়েডের সমস্যা, বিষণ্নতা বা অন্যান্য চিকিৎসাযোগ্য কারণ খুঁজে বের করা সম্ভব।

বর্তমানে ডিমেনশিয়া সম্পূর্ণ প্রতিরোধের নিশ্চিত উপায় না থাকলেও, এর ঝুঁকি অনেকটাই কমানো যায়। নিয়মিত শরীরচর্চা, সুষম খাদ্যাভ্যাস, রক্তচাপ, ডায়াবেটিস ও কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণ, ধূমপান ও অতিরিক্ত মদ্যপান পরিহার, পর্যাপ্ত ঘুম, মানসিকভাবে সক্রিয় থাকা এবং সামাজিক যোগাযোগ বজায় রাখা মস্তিষ্ককে সুস্থ রাখতে সাহায্য করে। একই সঙ্গে শ্রবণশক্তি হ্রাস, বিষণ্নতা ও একাকীত্বের মতো সমস্যারও সময়মতো চিকিৎসা করা প্রয়োজন।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো প্রাথমিক পর্যায়ে রোগ শনাক্ত করা **(Early Intervention)**। বারবার ভুলে যাওয়া, আচরণে পরিবর্তন বা দৈনন্দিন কাজে অসুবিধা দেখা দিলে সেটিকে 'বয়সের দোষ' বলে অবহেলা করা উচিত নয়। যত তাড়াতাড়ি রোগ নির্ণয় হয়, তত দ্রুত চিকিৎসা, পুনর্বাসন এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা শুরু করা যায়। এতে রোগের অগ্রগতি কিছুটা ধীর করা এবং রোগী ও তাঁর পরিবারের জীবনমান দীর্ঘদিন ভালো রাখা সম্ভব।

৬. চিকিৎসা (ওষুধ ও মনোসামাজিক চিকিৎসা)

বর্তমানে ডিমেনশিয়ার সম্পূর্ণ নিরাময়ের চিকিৎসা না থাকলেও, সঠিক সময়ে চিকিৎসা শুরু করলে রোগের অগ্রগতি কিছুটা ধীর করা, দৈনন্দিন কাজের সক্ষমতা বজায় রাখা এবং রোগী ও তাঁর পরিবারের জীবনমান উন্নত করা সম্ভব।

আলঝাইমার রোগের মৃদু থেকে মাঝারি পর্যায়ে **Donepezil, Rivastigmine** ও **Galantamine**-এর মতো ওষুধ ব্যবহার করা হয়। মাঝারি থেকে গুরুতর পর্যায়ে **Memantine** উপকারী হতে পারে। এসব ওষুধ রোগ সম্পূর্ণ সারায় না, তবে অনেক রোগীর ক্ষেত্রে স্মৃতিশক্তি, মনোযোগ

ও দৈনন্দিন কাজের দক্ষতা কিছুদিন ধরে রাখতে সাহায্য করে। রোগীর বিষণ্ণতা, উদ্বেগ, ঘুমের সমস্যা, উত্তেজনা বা সন্দেহপ্রবণতার মতো উপসর্গ থাকলে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ওষুধ দেওয়া হয়।

ওষুধের পাশাপাশি মনোসামাজিক চিকিৎসা (**Non-pharmacological Intervention**) সমান গুরুত্বপূর্ণ। **Cognitive Stimulation Therapy**, **Cognitive Rehabilitation**, **Reminiscence Therapy** এবং **Reality Orientation Therapy** রোগীর স্মৃতিশক্তি, আত্মবিশ্বাস ও দৈনন্দিন কার্যক্ষমতা বজায় রাখতে সহায়তা করে। নিয়মিত শরীরচর্চা, সামাজিক যোগাযোগ, পরিচিত পরিবেশ, নির্দিষ্ট দৈনন্দিন রুটিন, গান, ছবি দেখা, বই পড়া বা বাগান করার মতো সৃজনশীল কাজ রোগীর মানসিক সুস্থতা বজায় রাখতে সাহায্য করে।

মনে রাখবেন, ডিমেনশিয়ার সফল চিকিৎসা শুধু ওষুধের উপর নির্ভর করে না; ওষুধ, পুনর্বাসন, মানসিক সহায়তা এবং পরিবারের আন্তরিক সহযোগিতার সমন্বয়ই একজন রোগীকে দীর্ঘদিন স্বনির্ভর, নিরাপদ ও মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপনে সাহায্য করতে পারে।

৭. কেয়ারগিভারের ভূমিকা ও উপসংহার

ডিমেনশিয়া শুধু একজন মানুষের নয়, পুরো পরিবারের একটি যাত্রা। রোগের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে পরিবারের একজন সদস্য প্রায়শই কেয়ারগিভারের ভূমিকা পালন করেন। ওষুধ খাওয়ানো, নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করা, নিয়মিত চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া, ধৈর্য ও ভালোবাসার সঙ্গে রোগীর পাশে থাকা—এসবই তাঁর গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। তবে দীর্ঘদিন এই দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে কেয়ারগিভার নিজেও মানসিক চাপ, উদ্বেগ, বিষণ্ণতা ও **Caregiver Burnout**-এ ভুগতে পারেন। তাই রোগীর পাশাপাশি কেয়ারগিভারের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার প্রতিও সমান গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন।

ডিমেনশিয়ার সম্পূর্ণ নিরাময় আজও সম্ভব না হলেও, সময়মতো রোগ নির্ণয়, সঠিক চিকিৎসা, স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন, পুনর্বাসন এবং পরিবারের আন্তরিক সহযোগিতার মাধ্যমে একজন মানুষকে দীর্ঘদিন সম্মান ও মর্যাদার সঙ্গে বাঁচতে সাহায্য করা যায়।

মনে রাখবেন, ডিমেনশিয়া একজন মানুষের পরিচয় নয়; এটি তাঁর একটি রোগ মাত্র। হয়তো একদিন তিনি আমাদের নাম ভুলে যাবেন, কিন্তু আমাদের ভালোবাসা, মমতা ও সহানুভূতির অনুভূতিটুকু তাঁর কাছে রয়ে যাবে। তাই রোগটিকে নয়, মানুষটিকে দেখুন। কারণ স্মৃতি ম্লান হয়ে যেতে পারে, কিন্তু মানবিকতা কখনো মুছে যাওয়া উচিত নয়।

ডা. ইন্দ্রনীল সাহা, অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, মনোরোগ বিভাগ, কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ।

জনস্বাস্থ্য বুলেটিন-৬ (নব পর্যায়)

মনের রোগ এবং প্রতিকার

প্রকাশিত কয়েকটি পুস্তিকা :

- পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক স্বাস্থ্যব্যবস্থা : সুযোগ ও সংস্থান
- কুকুর, সাপ ও অন্যান্য কামড় এবং তাদের চিকিৎসা
- মশা বাহিত কয়েকটি মারাত্মক রোগ : ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু, জাপানি এনকেফেলাইটিস ও জিকা
- নতুন ও নতুন করে হওয়া কয়েকটি গুরুতর রোগ : কোভিড, নিপা, মাঙ্কিপক্স, অ্যাডেনো ভাইরাস ডিজিজ, ইবোলা, মারবার্গ, স্ক্রাব টাইফাস
- পতঙ্গ বাহিত আরও কয়েকটি গুরুতর রোগ : কালাজ্বর, চিকুনগুনিয়া, ফাইলেরিয়া
- পেটের রোগ এবং তাদের চিকিৎসা

জন আন্দোলনের মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য

একটি 'স্বাস্থ্য শিক্ষা উন্নয়ন' উদ্যোগ

স্বাস্থ্য শিক্ষা উন্নয়নের পক্ষ থেকে অরণি সেন কর্তৃক প্রকাশিত
যোগাযোগ: ssunnayan@gmail.com • ওয়েবসাইট: www.ssu2011.com
বিনিময় : ৮০ টাকা